তন্ত্র-বিজ্ঞান—শক্তিবাদ ও পূজাতত্ত্ব প্রসঙ্গে

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সংকলক

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

তন্ত্র-বিজ্ঞান—শক্তিবাদ
ও
পূজাতত্ত্ব প্রসঙ্গে

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সংকলক

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

প্রকাশক ঃ
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
১০, গালিফ স্ট্রীট
সুইট্ নং ৬৩, ব্লক নং—৫
কলকাতা-৭০০ ০০৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
দোলপূর্ণিমা
২২শে ফাল্গুন, ১৪১০
৬ই মার্চ, ২০০৪

অক্ষর বিন্যাসে ঃ
চন্দ্রশেখর এন্টারপ্রাইজ
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহেশ লাইব্রেরী ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী কলকাতা-৭০০ ০০৬	সর্বোদয় বুক স্টল হাওড়া স্টেশন শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৯

মূল্য ঃ ১২ টাকা মাত্র

নিবেদন

শ্রীমৎ মহানামব্রতব্রহ্মচারীজীর পুণ্যজন্ম-শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের অন্যতম সহ সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারীজী আমাকে অনুরোধ করেছিলেন শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে একটা লেখা দিতে। আমি ভেবে দেখলাম গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত তাঁর লেখা দিয়েই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবো কেননা তাঁর অপার তথা অকুণ্ঠ স্নেহ ও ভালবাসা পাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি "তন্ত্র-বিজ্ঞান, শক্তিবাদ ও পূজাতত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।"

'পূজার পরম আদর্শ' প্রাক্‌কথনরূপে যোগ করেছি পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের তত্ত্বপূর্ণ একটি লেখা যা তিনি লিখে দিয়েছিলেন পূজনীয় শ্রীমৎ প্রেমানন্দতীর্থস্বামী সংকলিত ও অনুভূত পূজা বইয়ের জন্য। প্রকাশিত হয়েছিল প্রাক্‌কথনরূপে পূজাগ্রন্থে—প্রকাশকাল জন্মাষ্টমী ১৩৬২ বঙ্গাব্দ এবং ইংরেজী ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ। বইখানা পূজ্য কবিরাজীর নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। বইখানার তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৮৭ সনে শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর নামে। ৪র্থ সংস্করণে বইয়ের নাম পরিবর্তন করে পূজাতত্ত্ব রাখা হয়।

এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদনে শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী লিখেছিলেন—"আমি পূজ্যপাদ আচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞেসা করিয়াছিলাম যে, এই সাধনার দ্বারা কি মানুষের অবশ্য প্রাপ্তব্য পূর্ণত্ব অর্জিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—'সদানন্দ, তোমার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে হইলেও বিশেষরূপে দিতে চেষ্টা করিব।'

পূজাই সাধনা, জ্ঞান ও ভক্তি সবই পূজার অন্তর্গত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শুধু পূজামাত্র হইতে সাধকের পূর্ণত্ব লাভ হয় না। এ বিষয়ে প্রকৃত রহস্য কি তাহা সংক্ষেপে তোমাকে জানাইতেছি।"

পূজার সার্থকতা এবং পূজার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে তাঁহার এই অপূর্ব ব্যাখ্যাটির প্রতি সুধী ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কামনায় গ্রন্থের পুরোভাগে "প্রাক্-কথনরূপে তাহা পরিবেশিত হইল।"

পূজ্য মহানামব্রতজীর শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য বর্তমান পুস্তিকার নামকরণ করা হয়েছে "তন্ত্রবিজ্ঞান-শক্তিবাদ ও পূজাতত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।"

তান্ত্রিক সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত দিয়ে তান্ত্রিক সংস্কৃতি উপর একটি ভাষণ তথা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে তান্ত্রিক সম্মেলন উপলক্ষে। ১৬ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে "পরামার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ" দশম খণ্ডে।

তান্ত্রিক বিজ্ঞানের তথা শক্তিবাদের উপর আলোকপাত করবার জন্য ঐ প্রবন্ধের প্রথম তিনটি পৃষ্ঠা পরিশিষ্টে সংযোজন করলাম। যাঁরা এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে উৎসুক তাঁরা এই প্রবন্ধটি পড়ে নেবেন এবং লাভবান হবেন।

পূজনীয় আচার্যদেব পূজাগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদনে বলেছিলেন—"বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের পূজা হইল একটি জীবন্ত অধ্যাত্ম সাধনা। এই অধ্যাত্ম সাধনার ধারা অনেক সময় ফল্গু স্রোত্রের মতন হইলেও আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস ইহাতেই ভারতের সমস্ত জাতীয় জীবন বিধৃত হইয়া আছে। যে সকল তামসিকভাবের আবরণ আসিয়া বর্তমানে আমাদের সত্যদৃষ্টিকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে তাহাকে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে আবার আমাদের সাধন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"

তিনি পূজার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় বলেছিলেন—"হিন্দু শাস্ত্রের প্রধান কথা—শ্রীভগবান আমাদের সমস্ত সত্তা জ্ঞান ও আনন্দের মূল প্রস্রবণ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী। তিনি পূর্ণস্বরূপ। আমাদের জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে পূর্ণতার লাভের চেষ্টাই ভগবৎ উপাসনা। ইহাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বা সাধনা। এইজন্য হিন্দুগণ সর্বত্র ভগবদদর্শন, সব জীব জগতের ভিতর দিয়া ভগবদ্ ধ্যান এবং সর্বজীবের সেবাকেই প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছেন। ভগবান শঙ্কর বলেছেন "পূজাতে বিষয়োপ ভোগ রচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ। সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো। যৎযৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভোতবারাধনম্।" ইন্দ্রিয় দ্বারা এমনভাবে বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে বিষয় গ্রহণের ভিতর দিয়া আমরা বিষয় সমূহের অন্তরাত্মা বিষয়ীকে প্রাপ্ত হইয়া বিষয় গ্রহণকে পূজায় পর্য্যবসিত করিতে পারি। ইহার ফলে আমাদের নিদ্রা সমাধিতে ভ্রমণ ভাবৎ প্রদক্ষিণে, উচ্চারিত বাক্যগুলি ভগবানের স্তোত্রে, আহার করা ভগবানকে আহুতি দেওয়ার—এমনকি সমস্ত কার্য পূজায় পরিণত হইবার সুযোগ লাভ করে। সাধক রামপ্রসাদের "যত শুন কর্ণপুটে, সকলই মায়ের মন্ত্র বটে," প্রভৃতি সঙ্গীতটির ভিতরে আমরা সব কাজকে পূজায় পরিণত করিবার কৌশলটি জানিতে পারি।"

আমার এই বিনম্র নিবেদন আর দীর্ঘায়িত করব না। গঙ্গাজল অতি অল্প হইলেও ত শুদ্ধিকারক।

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন উৎসর্গ করলাম শ্রীমন্ মহানামব্রতজীকে। তিনি গ্রহণ করে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সার্থক করবেন—এই আশা নিয়েই আমার নিবেদন সমাপ্ত করছি।

দোলপূর্ণিমা — ওঁ তৎ সৎ

২২শে ফাল্গুন, ১৪১০ — বিনীত সংকলক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

৬ই মার্চ, ২০০৪

প্রাক্‌কথন

পূজার পরম আদর্শ

মানুষ পঞ্চকোশ বিশিষ্ট জীব। অন্নময় ও প্রাণময় কোশের বিকাশ, এবং মনোময় কোশের পূর্বাভাস, মানুষের চৌরাশী লক্ষ পূর্বতন যোনিতে পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু মনোময় কোশের বিকাশ মনুষ্যদেহ হইতেই আরম্ভ হয়। মনুষ্যদেহের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মনোময় কোশের বিকাশ সম্পন্ন হয়। বিবেকজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, সদসদ্‌বিবেচন মনুষ্যদেহ লাভের পূর্বে হয় না। কর্তৃত্বাভিমানের অভিব্যক্তি মনুষ্যদেহের বৈশিষ্ট্য। মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াও প্রকৃতিতে পশুভাব দীর্ঘকাল থাকিয়া যায়। তাহার পর সদসদ্‌বিবেকের পরিস্ফুট অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এই নৈতিক জীবনের মহত্ত্বই পশুজীবন হইতে মনুষ্যজীবনকে উৎকর্ষ দান করে। যদি শ্রীভগবানের কৃপা লাভ হয় তাহা হইলে এই নৈতিক জীবন বিশিষ্ট মনুষ্যের আধারেই পূর্ণতার বীজ নিহিত হয়। সর্বপ্রথম মনুষ্যের জীবন এমনভাবে গঠিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও সংকোচভাব দূর হইয়া ব্যাপক ও উদারভাব বিকশিত হইতে পারে। যাহার ফলে মনুষ্য একদিকে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা অন্তর্মুখ গতিতে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় ও অপরদিকে বাহ্য ব্যাপকসত্তার সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া বিশ্বকল্যাণে ব্রতী হইতে পারে। ইহার জন্য শ্রীভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন যে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান মুখ্য সোপান। কর্তব্যবোধে সুচারুভাবে কর্মসম্পাদন করিয়া কর্মফল ভগবান্‌কে অর্পণ করা। কর্মফলে অনাসক্ত থাকিলে চিত্তশুদ্ধি অনিবার্য্য এবং কর্মের অনুষ্ঠানও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, ইহারই নাম যোগস্থ কর্ম। কর্ম নিজে করিতে হইবে, কিন্তু সেই কর্মের প্রাপ্যফল সমগ্রবিশ্বে বিতরণ করিতে হইবে; স্বকৃত কর্মফলের উপর দাবী না রাখা ইহাই উর্দ্ধগতির প্রথম সোপান। এইস্থলে সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্যমূল্য হইয়া যায়। তাহার প্রভাবে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়। কর্ম নিরূপণ গুরু অথবা উপদেষ্টার অধীন। দেশকাল ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে তাহার বিবেচন আবশ্যক।

এইভাবে দীর্ঘকাল কর্মে ব্রতী থাকিলে, একপক্ষে বাহ্যজগতের সঙ্গে নিজের যোগ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং অপরপক্ষে নিষ্কামতাবশতঃ চিত্তশুদ্ধি হয় বলিয়া সহজভাবে জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞান শাস্ত্র হইতে উপলব্ধ জ্ঞান নহে, ইহা নিজের উপলব্ধি-জন্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয়ে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষ যত বড় কর্মীই হউক না কেন, বস্তুতঃ নিজে কিছুই করে না। সে স্পষ্ট দেখিতে পায় ত্রিগুণা প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা যাবতীয় কর্ম নিষ্পন্ন হয়। সে নিজে শুধু অহংকার বিমূঢ় হইয়া নিজেকে কর্তা মনে করে — 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়-মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা 'হমিতি মন্যতে'॥

পূজাগ্রন্থে মানুষের আরোহ-গতির দিকটা বলা হইয়াছে। এইখানে সংক্ষেপে ভগবানবে সঙ্গে নিয়া তাহার অবরোহ-গতির কথা বলা হইল। এই উভয় গতিতে প্রাথমিক গতি সমাপ্ত হইল। ইহার পরেও যে গতি আছে তাহা স্থিতির সহিত অভিন্ন—তখন স্থিতিও গতি, গতি ও স্থিতি, শিবই শক্তি, শক্তিই শিব—ইহাই অদ্বয়তত্ত্ব।

পারমার্থিক রাজ্যের নিয়ম এই যে, পূজার পর প্রণাম হয় এবং প্রণামের পর হয় প্রসাদ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূজা তখনই সমাপ্ত হয় যখন তাহার ফলে মমত্ব এব অহন্তা পূর্ণভাবে চলিয়া যায়। গীতাতে শ্রীভগবান ইহাকে নির্মম নিরহংভাব বলিয়া ব্যাখ্য করিযাছেন। বস্তুতঃ পূজার পর এবং যাবতীয় সেবার পর, প্রণামই অহংভাব নিবৃত্তির চরম স্থিতি। নিজের মধ্যে তখন শূন্যভাবের পর পরিপূর্ণ রিক্ততার আবির্ভাব হয়। ইহার পরের অবস্থাই প্রসাদ। এই অবস্থায় শ্রীভগবান ভক্তের রিক্ততা পূর্ণ করিয়া দেন, অর্থাৎ নিজ সত্তাদ্বারা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরম সত্তা দ্বারা, তাহার রিক্ততাকে পূরণ করিয়া দেন ইহাই ভক্তের দিক হইতে প্রসাদ গ্রহণ নামে পরিচিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে ভগবৎ কৃপায় যে পূর্ণ ভাগবত-জীবন প্রাপ্তি হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে পূজার অনুরূপ প্রসাদ। ভক্ত পূজা করিতে গিয়া আত্মসমর্পণের ফলে বুঝিতে পারেন তিনি কিছুই নন। ভগবান্ প্রসাদ দিয় তাহাকে বুঝাইয়া দেন তুমিই সব কিছু, তুমিই তো ভগবান। পূজা ঠিক ভাবে সম্পন্ন হইলে যথাসময়ে প্রসাদ অবশ্যই আসিবে, তাহাতে অন্যথা হইতে পারে না।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

সূচীপত্র

তন্ত্রবিজ্ঞান

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে দুইটি ধারা বিদ্যমান আছে, বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক ধারার ভিত্তি বেদ ও উপনিষদ্। তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি অগণিত তন্ত্রগ্রন্থ। বৈদিক ধারার পূর্ণতা ভগবদ্‌গীতায়। তান্ত্রিক ধারার চরম পরিণতি সপ্তশতী-চণ্ডীতে।

বেদের অপর নাম নিগম, আর তন্ত্রের অপর নাম আগম। নিগম ও আগম শব্দ দুইটির অর্থ একই, যাহা হইতে সকল জ্ঞান নির্গত হইয়াছে বা আসিয়াছে। উভয়ই নিখিল জ্ঞানভাণ্ডার। ঋষির দৃষ্টিতে উভয়ই অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের দ্বারা রচিত নহে। ঋষিগণের অনুভব এই যে, সত্য কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না। যাহা কোন সময়ে সৃষ্ট, বা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অনিত্য ও অসত্য। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই বিদ্যমান, তাহার অভাব ত্রিকালে কখনও হয় না। শ্রীগীতাও একথা বলিয়াছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২।১৬)

অসতের বিদ্যমানতা নাই ও সদ্‌বস্তুর কখনও অভাব হয় না। সত্যের স্রষ্টা নাই, থাকিতে পারে না। সত্যের আছে দ্রষ্টা বা স্মর্ত্তা, সত্যের দর্শন হয়, সত্যের স্মরণ হয়, সত্য সৃষ্ট হয় না কখনও। যেহেতু তন্ত্র ও বেদ উভয়ই সত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেই কারণেই তাহারা অপৌরুষেয়। অধিকাংশ তন্ত্রেরই শিব বক্তা এবং পার্বতী শ্রোতা। আদি পিতা বলিতেছেন ও আদি মাতা শ্রবণ করিতেছেন। ইহার অপৌরুষেয় তত্ত্বই স্থাপিত হইয়াছে। যাহা অপৌরুষেয়, তাহার উৎপত্তিকাল বা বয়স নির্দ্ধারণের চেষ্টা অর্থহীন। বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের বয়স নির্দ্ধারণের প্রভূত চেষ্টা বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয়। আর্য্য ঋষির দৃষ্টিতে ইহা নিরর্থক। গাছ হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে গাছের জন্ম। গাছ আগে না বীজ আগে এই প্রশ্নের যেমন সমাধান নাই, মর্ত্ত্যের স্রষ্টা কে বা কবে সৃষ্ট হইল তাহারও সেইরূপ সমাধান নাই।

জ্ঞান দ্বিবিধ—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। জ্ঞানের মধ্যে দুইটি বস্তু আছে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। যিনি জানেন্ তিনি জ্ঞাতা এবং যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহা জ্ঞেয়। দর্শনের কার্য্য জ্ঞাতার তত্ত্বানুসুন্ধান। বিজ্ঞানের কার্য জ্ঞেয়বস্তুর তথ্যানুসন্ধান। আমি ফুলটি দেখিতেছি। 'আমি কে'—ইহা লইয়া গবেষণা দার্শনিকের কার্য্য। আর ফুলটির উপাদান কি—ইহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য।

দর্শন সংশ্লেষাত্মক (Synthetic) আর বিজ্ঞান বিশ্লেষণাত্মক (Analytic)। দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ডের দিকে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি খণ্ডিত জগতের দিকে। দর্শন দেখে সামগ্রিকভাবে, বিজ্ঞান দেখে খণ্ড খণ্ড ভাবে। সমস্ত বাগানটি একসঙ্গে দেখা দার্শনিক দৃষ্টি, আর প্রত্যেকটি গাছ আলাদা করিয়া দেখা বৈজ্ঞানিকদৃষ্টির পরিচায়ক।

তান্ত্রিকগণ বৈজ্ঞানিক ভাব ও দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহাদের সাধনার ফলে ভারতে বহু গভীর

গবেষণাপূর্ণ বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের দান যে কতদূর উন্নততর ছিল তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের *History of Hindu Chemistry* ও মহামনীষী ব্রজেন শীল মহাশয়ের Positive Science of Hindus গ্রন্থদ্বয়ে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তন্ত্র শব্দের অর্থ যে কোন বিষয়ে গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ সুসামঞ্জস্য তথ্যনিরূপণ (systematic scientific study)। যেমন শল্যতন্ত্র বা Surgery হইতেছে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা। দেহের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে "সুশ্রুত সংহিতার" দান পাশ্চাত্ত্য দেশীয় অধুনাতম গ্রে সাহেবের Anatomy হইতে কোন অংশে হীন নহে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান এখনও তন্ত্রাচার্যগণের সূক্ষ্মদেহ বিষয়ক গভীর বিশ্লেষণের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার প্রভৃতির তত্ত্ব এখনও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের স্বপ্নের অতীত।

ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, খগোল বা আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তন্ত্রের বহু অবদান রহিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্র, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানের যে দান, উহারও মূল তন্ত্রশাস্ত্রই।

পরিবর্তনশীল যাহা তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রের বিচার্য্য। যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহা বেদ-বেদান্তের আলোচ্য। জগতের সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং জাগতিক বস্তুমাত্রই তন্ত্রের আলোচনার বিষয়। সাধারণ মানবের নিকট মল, মূত্র, থুৎকারাদি ঘৃণার বস্তু। কিন্তু একজন বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকের নিকট উহার মূল্য কম নয়; কারণ, উহা ব্যাধির বিষয়ে সত্যনিরূপণে সাহায্য করে। লিঙ্গ যোনি ইত্যাদির আলোচনা সাধারণের কাছে অশ্লীল, কিন্তু তন্ত্রবিজ্ঞানীর নিকট উহা অমূল্য কারণ, উহা সৃষ্টিরহস্যের গভীর মূলদেশের সংবাদ দেয়।

দর্শনের আলোচনার বিষয় নিত্য শাশ্বত বস্তু। ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বস্তু দেশকালের সীমার উর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু এই দেশকালাতীত সত্তা কেমন করিয়া দেশকালের মধ্যে ধরা পড়িল ইহা দার্শনিকের ধ্যানের বিষয়। আর দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ ও পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর মূল রহস্য অনুসন্ধানে তন্ত্রবিজ্ঞান দার্শনিক অনুধ্যানের নিকটবর্ত্তী। ইহা অত্যুক্তি হইবে না যে বেদান্তদর্শন জগদতীত তত্ত্ববস্তু লইয়া জগতের মধ্যে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করেন আর তন্ত্রবিজ্ঞান জাগতিক বহু বস্তুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্বলাভের প্রয়াসী হন। কেবল অখণ্ড বা সামগ্রিক জ্ঞান পূর্ণ নহে, আবার কেবল খণ্ডের বা অংশের জ্ঞানও চরম নহে। জ্ঞান তখনই পূর্ণ হয় যখন উহা খণ্ড ও অখণ্ড প্রকার অনুভূতি দান করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টি ও তন্ত্রের বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গী এক পূর্ণ সত্যানুভূতির পক্ষে অপরিহার্য্য। একটি পাখির ডানার মত যেন এক অখণ্ড সত্যের দুইটি দিক্। তন্ত্র ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক।

তন্ত্র বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্তকে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে রূপদান করা।

সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বহু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই প্রয়াস। বহুবিধ অনুষ্ঠানাদির আলোচনায় তন্ত্রশাস্ত্র পূর্ণ। সত্যকে জীবনের মধ্যে আনিতে হইলে অনুষ্ঠান চাই। কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরই ইহার সবকিছু নহে। চিত্তের আবেগ, অভীপ্সা, সহৃদয় আকুতি প্রভৃতি ভাবময় বস্তুও অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্লীন। তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য্য কেবল বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কতকগুলি হৃদয়াবেগ ও গভীর সংকেত ইহার সহিত যুক্ত আছে যাহা বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। ক্রোড়স্থিত শিশুর গণ্ডে স্নেহময়ী জননীর একটি চুম্বনের মাধুর্য্য যেমন মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের বিশ্লেষণ দ্বারা লাভ করা যায় না, তদ্রূপ ভক্তিপূতচিত্তে ইষ্টদেবের চরণে একটি সচন্দন পুষ্প নিবেদন কেবল উপচারগুলির বিশ্লেষণে পর্য্যাপ্ত হয় না। তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সু-প্রাচীন কাল হইতে বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকল তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করিতেছে। কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যজ্ঞা পূজা উভয়ই অপরিহার্য্য। যজ্ঞ ও পূজা উভয়ই অপরিহার্য্য। যজ্ঞ বেদের দান, আর পূজা তন্ত্রের। বেদ ও তন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক।

পাশ্চাত্তদেশে বৈজ্ঞানিকগণ দার্শনিক আলোচনার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তাঁহারা সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে একত্র করিয়া ও বিজ্ঞানগুলিকে একত্র করিয়া একটি দার্শনিক দৃষ্টিলাভের প্রয়াসী (unity of the sciences)। প্রচলিত দার্শনিক মতবাদকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, কারণ বর্ত্তমান বিজ্ঞান, পাশ্চাত্যদর্শনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। অধ্যাত্মদর্শনে বাইবেলের সিদ্ধান্ত, যেমন ছয় দিনে ভগবান্ এই বিশ্বরচনা করিয়াছেন; আদম ও ইভ আদি মানব-মানবী, ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে চায় না। কারণ বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে—এই বিশ্বসৃষ্টি হইতে বহু কোটি বর্ষ লাগিয়াছে; ক্রমবিবর্ত্তনের নীতি (theory of evolution) অনুসারে বানর হইতে মানুষের জন্ম, আদম ও ইভ হইতে নহে ইত্যাদি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই অসামঞ্জস্য পাশ্চাত্ত্য দেশের সংস্কৃতিকে দুর্বল করিতেছে। ইহাদের মিলনের একটা ভিত্তি রচনা চাই-ই চাই। তাহারই প্রয়াসের ফলস্বরূপ বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতা (philosophy of the scientists) প্রভৃতি আন্দোলন পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে গড়িয়া উঠিতেছে। স্যার জেম্স্ সাহেবের *The Mysterious Universe, The Universe Around Us*, এডিংটন সাহেবের The Nature of the Physical World এবং আইনস্টাইন সাহেবের God প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতার ফল বলা যায়। শুধু খণ্ডের আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সকল খণ্ড মিলিয়া কোন অখণ্ডের সংবাদ বহন করিয়া আনে কিনা, তাহা বুঝিবার প্রয়াসই এই বৈজ্ঞানিকের দার্শনিকতা।

ভারতীয় তন্ত্রবিজ্ঞান প্রাচীনকালে অনুরূপ কার্য করিয়াছে। প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক হইলেও বস্তু-বিশ্লেষণে গভীরভাবে নিযুক্ত থাকিলেও, সব মিলিয়া একটি একত্বের বা অখণ্ড সত্তার

সন্ধান মিলে কিনা তাহাই জানিবার চেষ্টা করিয়াছে তন্ত্রবিজ্ঞান। ফলে তন্ত্রের একটা নিজস্ব দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্ত্রদর্শন বেদান্তদর্শনের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। একের মধ্যে অপরে পূর্ণতার সন্ধান পাইয়াছে। ছোটখাট বিরোধ ও বিভেদ ঘটিলেও উহা জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয় নাই।

বেদান্তের সিদ্ধান্তের নাম ব্রহ্মবাদ, তন্ত্রের চরমতত্ত্ব শক্তিবাদ। এতদুভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও পরিণামে ইহারা পরস্পরের পরিপূরক হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছে। বেদ ও তন্ত্রের এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন জাতির জীবনে মহা গৌরবের দ্যোতক। পাশ্চাত্ত্যদেশে যে বহুবিধ অশান্তি, যাহার প্রভাবে প্রাচ্যও আজ বিড়ম্বিত, তাহার বাহ্যিক কারণ যাহাই হউক, পারমার্থিক কারণ দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ। পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মদর্শন দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর ও আত্মার তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বরহস্য তন্নতন্ন করিয়াও জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোন সন্ধান পায় নাই। যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বহির্ভূত, উহাতে বিশ্বাস বা আস্থাস্থাপন অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন আজ ম্রিয়মাণ। কিন্তু ভারতীয় ঋষি বেদ ও তন্ত্রের, দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর্ব মিলন ঘটাইয়া সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে অমৃতের সন্ধান দিয়াছেন উহা আজও অমর হইয়া আছে। যুগে যুগে শত আঘাত ও বিপর্য্যয় হইতে ইহা জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করিয়াছে।

শক্তিবাদ

বাংলার বিশেষ সম্পৎ শক্তির উপাসনা। গৌড়ীয়া-বিদ্যা তন্ত্রের আর এক নাম। বর্ত্তমানে তন্ত্রবিষয়ে গবেষণা বা আলোচনা নাই বলিলেই হয়। আত্মভোলা বাঙালী জাতি নিজ সম্পদ্ সম্বন্ধে যদিও একেবারে উদাসীন, তাহা সত্ত্বেও তন্ত্রের সাধনার ধারা একেবারে মৃত নহে। আমাদের স্মরণকালের মধ্যেই রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদের তন্ত্রধারায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই সাধনাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শক্তিবাদ তন্ত্রবিজ্ঞানের বিরাট দান। দার্শনিক দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের মত শক্তিবাদ একটা মতবাদ নহে কারণ, ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি তর্ক, বিচার ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তি পরীক্ষিত-সত্য (experimental truth)। অনুভূতি দুই প্রকার—ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সর্ব্বজনীন অনুভূতি। কোন বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে বিচার, তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন হয়। যাহা সর্ব্বজনীন তাহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া উহা অখণ্ডনীয়। শক্তিবাদ অনুরূপ একটি অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত।

শক্তিবাদের প্রথম সিদ্ধান্ত শক্তি আছে। ইহা সকলের অনুভববেদ্য। ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর আছেন ইহা সাধারণের অনুভবের অতীত, যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থাপন করিতে হয়—তীক্ষ্ণতর যুক্তি দ্বারা আবার উহা খণ্ডিতও হইতে পারে। শক্তিবাদ সেরূপ নহে, ইহা অখণ্ডনীয়। শক্তি নাই বলিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। শক্তি অস্বীকার করিতেও শক্তির প্রয়োজন। শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে বুদ্ধিশক্তি, বিচারশক্তি, বাক্শক্তির দ্বারস্থ হইতে হইবে। ভগবান্ আছেন আপত্তি হইতে পারে, শক্তি আছে ইহাতে আপত্তি করা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া যে-বস্তুর আশ্রয় লইতে হইতেছে তাহাও শক্তি। অতএব উহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য।

শক্তি আছে, ইহা শক্তিবাদের চরম কথা নহে। শক্তিবাদের অন্তরের কথা, একমাত্র শক্তিই আছে, নিখিল বিশ্বে শক্তি ছাড়া আর কিছুই নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তুই শক্তির সমবায় (conglomeration of energy)–বস্তুমাত্রই শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এক একটি বস্তু, শক্তির এক একং ধরণের প্রকাশ। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—দেবী মহাশক্তি সর্ব্বভূতে শক্তিরূপেই বিরাজিতা—ইহাই তন্ত্রের মহতী-ঘোষণা। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সহিত তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিউটন সাহেবের সময় হইতে তিনশত বর্ষের জয়যাত্রার মধ্য দিয়া আজ বৈজ্ঞানিকেরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, উহা একান্তভাবে তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। পারমাণবিক আবিষ্কারের

ফলে একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতে বস্তু (matter) সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বস্তুমাত্রই যে শক্তির সমবায় উহাতে এখন আর কাহারও সংশয় নাই।

শক্তিবাদের তৃতীয় কথা, সর্ব্বভূতে অর্থাৎ এই নিখিল বিশ্বচরাচরে একটিমাত্র শক্তিই আছে। বহু যে দেখি—তাপ (heat), আলো (light), বৈদ্যুতিক শক্তি (electricity)–উহা দৃষ্টির ভ্রমবশতঃই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া দেখিলে সবই একই শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও পরমাণু (atom) জগতের মূল কারণ—বিজ্ঞানের এইরূপ সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আজ এই মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সকল বস্তুই যে এক শক্তির পরিণতি, ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মূলে যে একটি মাত্র শক্তি বিদ্যমান, ইহা আজ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বহুকালের গবেষণার পর পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান আজ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে—বিশ্বের মূলে একই শক্তি কাজ করিতেছে, ইহা ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র বহু পূর্ব্বেই দ্বিধাহীনকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য-বৈজ্ঞানিকগণ আজ শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহাদের শাক্ত আখ্যা দেওয়া যায় না। শক্তি মানিলেই শাক্ত হয় না, শক্তির পূজারী হওয়া চাই। ভারতবর্ষে শক্তির যেরূপ পূজা হয়, পাশ্চাত্ত্যদেশে তদ্রূপ হয় না। কারণ শক্তি বিষয়ে উভয় দেশের দৃষ্টিভঙ্গীরর মৌলিক পার্থক্য আছে। তন্ত্রবিজ্ঞানের সহিত পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞানের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এবার বৈসাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে, পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান কেন শক্তির পূজারী নয়।

বিশ্বের মূল শক্তি এক ও অদ্বিতীয়, এ বিষয়ে বিরোধ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই শক্তি জড় অর্থাৎ প্রাণ বা চৈতন্যবিহীন। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কখনও জড় নহে। ইহা সর্ব্বতোভাবে চৈতন্যময়ী "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে"—সর্ব্বভূতে চৈতন্যস্বরূপে বিরাজিতা দেবী মহাশক্তিই।

জড়বস্তু আকারে যতই বড়ই হউক, সম্মানের দাবি করে না। সুবৃহৎ হিমালয় পর্ব্বতের উপর হাঁটিয়া যাইতে কাহারও উদ্বেগ হয় না। কিন্তু চেতনসত্তাসম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও তদ্রূপ উপেক্ষা করা যায় না। চেতনা মর্য্যাদার দাবি রাখে। চৈতন্যময়ী বলিয়া জানিলে পাশ্চাত্ত্যে শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন হইতেও পারে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আজ শক্তির কেবল স্বীকৃতিই হয় নাই, উহা চৈতন্যের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞানী বিশ্বের মূল শক্তিকে মনঃসত্তা (mind stuff) এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্যর জেম্‌স্ সাহেবের মতে বিশ্বের মূল সত্তার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান অনুমিত হয়। নচেৎ এই বৈচিত্র্যময় বিরাট সৃষ্টি কখনও এত নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারিত না।

তাঁহার মতে এই বিশ্বের কোথাও এতটুকু অঙ্কের ভুল দৃষ্ট হয় না। অঙ্কশাস্ত্র জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে। আর বিচারশক্তি চেতনার উপর নির্ভরশীল। মূলশক্তি অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন (mathematical) বলাতে, শক্তির চৈতন্যসত্তা এক প্রকার স্বীকার করাই হইল। ইহা ছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের আরও দুই একটি রহস্যের কথা বলিতেছি।

বর্ত্তমান পদার্থ বিদ্যা (modern physics)- এর একটি নীতি হইতেছে অনির্দ্দেশ্যবাদ (Law of Indeterminancy)। একটা সৌরজগৎ যেরূপ—মধ্যে সূর্য্য, চারিপাশে ঘূর্ণায়মান গ্রহগণের অবস্থিতি— সেইরূপ একটি পরমাণুর মধ্যে প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহের ন্যায় ইলেকট্রনগুলি ঘুরিতেছে। সৌরমণ্ডল ও পরমাণুমণ্ডলের পার্থক্য এই যে, সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষে থাকিয়া সূর্য্যকে পরিক্রমা করে। কিন্তু পরমাণুমণ্ডলের মধ্যে ইলেকট্রনগুলি ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের কক্ষ পরিত্যাগ করে। এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে চলিয়া যায়। চলার ভঙ্গি দৌড় নহে, লম্ফন (jump)। লম্ফনের মধ্যে বৈচিত্র্য এই যে, এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইবার সময় মাঝখানে কোথাও থামে না। কখন কোন্ ইলেক্ট্রন এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবে এবং কি তার গতিবেগ (velocity), তাহা নির্দ্ধারণের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাহার স্থিতিস্থান (position) ও গতিবেগ (velocity) এই দুইয়ের একই-কালে শুদ্ধ-নির্দ্ধারণ কিছুতেই সম্ভব নয়। কোনও মুহূর্ত্তে ইলেকট্রনের স্থিতি নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইলেও তাহার গতি জানা যায় না। আবার ইলেক্ট্রনের গতি নিশ্চিতরূপে জানিলেও সেই মুহূর্ত্তে তাহার স্থিতি নির্ভুলভাবে জানা যায় না। ইহাই হাইসেনবার্গ সাহেবের অনির্দ্দেশ্যবাদ। ইহাতে ইলেক্ট্রনের স্বাধীনতা অনুমিত হয়।

১৯৪৭ সালে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সাহেব ইউরেনিয়ম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর আভ্যন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) বিস্ফোরণ ইত্যাদি হইতে প্রমাণ করিলেন যে, বিজলিবাতির তারের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর ইলেক্ট্রন, তেজ ও উত্তাপের তাড়না ও প্রভাব ছাড়াই স্বাধীনভাবে কক্ষ ত্যাগ করিয়া যায়।

ইলেকট্রনের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া এডিংটন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুর আভ্যন্তরিক শক্তির মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব অনুমান করেন। কারণ চেতনা ছাড়া স্বাধীন-ইচ্ছা বা চেষ্টা সম্ভব নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উন্নত-বিজ্ঞান, চেতনার স্বীকৃতির সীমানায় পৌঁছিয়াছে। শক্তি যে চেতনাসম্পন্ন ইহা আজ বিজ্ঞানের অনুমিতি। পরীক্ষায় নিরীক্ষায় অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে শক্তি যে চেতনাময়ী ইহা তন্ত্রাচার্য্যগণের অনুমিতি নহে, অনুভূতিও বটে। গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া সত্য নহে—তপস্যা দ্বারা উপলব্ধ-সত্য।

তবে জড়বস্তুর মাধ্যমে চেতনার অনুসন্ধান দ্বারা চৈতন্যময়ী মহাশক্তির তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন

2

কখনও সম্ভব হইবে না। চেতনার মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপিণী শক্তিকে জানিতে হইলে আত্মস্থ হওয়া দরকার। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সেইরূপ প্রচেষ্টাও লক্ষিত হইবে, ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

তন্ত্রের মহাশক্তি এক, অদ্বিতীয় ও চৈতন্যরূপিণী। ইহাই চরম কথা নহে। চৈতন্যময়ী দেবীর স্বরূপে অসীম-করুণা নিহিত আছে। করুণারূপ মহাসম্পদের খবর তাঁহার কৃপাতেই কেবল জানা যায়। বাহ্য-আচরণের কাঠিন্যের মধ্যেও মহাকরুণাই লুক্কায়িত আছে "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।" যুদ্ধে অসুর-নিধনরূপ কার্য্য দ্বারা তাঁহার অপরিসীম-করুণার পরিমাপ করা যায় না। করুণার স্বরূপ প্রকাশ করাও একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তন্ত্রবিজ্ঞান বলিয়াছেন—ইনি মাতৃরূপা। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র এই মাতৃত্ব বিদ্যমান। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" বিশ্বের সকল মাতৃহৃদয়ের স্নেহকরুণা একত্র করিলেও দেবী মহামায়ার মাতৃত্বের সমান হয় না।

সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক-মতবাদ এই যে, আমাদের সূর্য্য হইতে বৃহত্তর এক সূর্য্য কোন অজানা-কারণে ইহার নিকট দিয়া বেগে চলিয়া যায়। সেই বৃহত্তর সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণে আমাদের সূর্য্যের অঙ্গহানি ঘটে। নয়টি অংশ ছুটিয়া বাহির হয় ইহার দেহ হইতে। কিন্তু এই অংশ বা গ্রহগুলি একেবারে হারাইয়া যায় নাই। সূর্য্য হইতে বাহির হইয়া এক-একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া ইহারা সূর্য্যকেই পরিক্রমা করিতেছে। সূর্য্য যেমন গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, হারাইয়া যাইতে দেয় নাই, এই বিশ্বও মহামায়া হইতে আসিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে স্থির আছে। আমরা না বুঝিলেও মাতৃবৎ করুণা যে আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছে ও ধ্বংস হইতে দেয় নাই, ইহা তন্ত্রের কল্যাণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ করুণা দেখা যায় না, হৃদয়বৃত্তির সম্প্রসারণে তার অনুভবই হয়। পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের মাথা আছে, হৃদয় নাই। তন্ত্রবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়াবেগ যুক্ত হইয়াছে। সেই হেতু জড়বিজ্ঞানে যাহা দেখিতে অসমর্থ, তাহা তন্ত্র-বিজ্ঞান দেখিতে পাইয়াছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি জড়, তাই উহাকে সংহত বা অধীন (control) করিয়া মানবের সুখসুবিধার্থে নিয়োগ করা বৈজ্ঞানিকের চেষ্টা। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিজ্ঞান শক্তির চৈতন্যস্বরূপে বিশ্বাসী বলিয়া, শক্তিকে অধীন করিয়া নিজ সুবিধানার্থে প্রয়োগের পক্ষপাতী নহে। চেতনবস্তু অধীন হইতে চাহে না। তাহাকে অধীন (control) করিতে চেষ্টা করিলে ফল ভাল হয় না। একটি বালকও যদি বুঝিতে পারে যে তাহাকে অধীন করিয়া যথেচ্ছ চালিত করিবার কেহ চেষ্টা করিতেছে, সে তখন আর উহা অম্লানবদনে মানিয়া লয় না। তন্ত্রমতে বিশ্বের মূল যে শক্তি, যাহা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, তাঁহাকে অধীন করিয়া ভোগ করিতে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। সেই শক্তিরূপা দেবীকে জানিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পূজা করিলে, তাঁহার কৃপাতেই বিশ্বের সকল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়।

চণ্ডীগ্রন্থে উক্ত আছে, রূপলাবণ্যবতী মাতৃদেবীর মহাশক্তির কথা শুনিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ তাঁহাকে বিবাহ অর্থাৎ ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে পরিণামে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। শক্তি ভোগের বস্তু নহে। তিনি মাতৃরূপা ও বিশ্বের সকল দেব ও মানবের পূজ্যা। মায়ের আরাধনাতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির দ্বারা সাধক শান্তির অধিকারী হন। পক্ষান্তরে, সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ হইলে ও শক্তিরূপিণী মাকে ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে, ফল শুভ হয় না। তন্ত্রমতে ইহা আসুরিক প্রয়াস। রাবণ দৈবশক্তিকে জয় করিয়া উহা নিজ সুখভোগে নিয়োজিত করেন। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ রাবণের আজ্ঞাবহ দাসের মত সেবা করিতেন। কিন্তু আড়ালে তাঁহারা রাবণের বিনাশের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অভিলাষ পূরণ করেন। মানব-সভ্যতা যখন কেবল ভোগোপকরণের সমৃদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখপরায়ণ হইয়া উঠে এবং আধ্যাত্মিক নীতি ও মানবতার শ্রেষ্ঠ অবদানসকল পদদলিত করিয়া চলে, তখন সেই আসুরিক সভ্যতা যে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় থাকে না।

পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার ধ্বংসের রূপ ও মানবের ধ্বংসমূলক কার্য্যে উহার নিয়োগ ও প্রস্তুতির প্রয়াস দেখিয়া সারা বিশ্বে আজ ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে। নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সমুন্নত ও মানবের কল্যাণকামী কোন বিশ্বমানব-সংস্থা (World board)-এর উপর এই পারমাণবিক শক্তির পরিচালনার ভার ন্যস্ত না হইলে মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। তন্ত্র-বিজ্ঞানের এই অভিমত।

মহাশক্তির সহিত যুক্ত হইলেই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। যুক্ততা নষ্ট হইলে আসে দুঃখ ও অশান্তি। জীবনে দুঃখ আসিলে বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-জীবন মায়ের নিকট হইতে বিযুক্ত, শক্তিহীন হইয়াছে। তন্ত্রমতে মহাশক্তির সহিত যোগসূত্র স্থাপনের উপায় পূজা।

দেবীসূক্ত

বৈদিক ও তান্ত্রিক দ্বিবিধ চিন্তাপ্রবাহের দুইটি ধারার মিলনসূত্র হইল দেবীসূক্ত। শ্রীচ
পাঠের প্রথমেই দেবীসূক্ত পাঠের বিধি। এই সূক্তটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্য
সূক্ত। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য এই সূক্তটি জপ করিয়া মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলে
"স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।" (চণ্ডী, ১৩।১০)

এই বৈদিক সূক্তটির জপদ্বারা তন্ত্র-প্রতিপাদ্য মহাশক্তির অর্চ্চনা ও সাক্ষাৎকার হইয়
এই জন্য এই সূক্ত, দুইটি ধারার মিলনসূত্র বলা হইয়াছে।

বৈদিকমন্ত্র ত্রিবিধ—পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক। দেবীসূক্তের মন্ত্রগু
আধ্যাত্মিক। ঋষি এখানে নিজেই নিজের স্তুতি করিতেছেন। দ্রষ্টা ঋষি হইলেন অম্ভৃণ-ক
ব্রহ্মা-বিদুষী বাক্। দেবতা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। ঋষির নামানুসারে এই সূক্তটিকে বাক্সূক্ত
বলা হয়। আত্মস্তুতি বলিয়া সূক্তটি আধ্যাত্মিক।

এই মন্ত্রের অর্থবোধ হইলে অনুভব হইবে যে, তন্ত্রশাস্ত্রে যে মহাশক্তির কথা ব
হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ঋষি-কন্যাকে যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মাধ্যমে স্বকীয় পর
স্বরূপ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থে প্রবেশ করিবার জন্য এই স
তোরণস্বরূপ। যে সকল তত্ত্ব চণ্ডীগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় তৎসমুদয় বীজাকারে এই দেবীসূ
বিরাজমান।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন যে, এই দেবীসূক্তে বাগ্‌দেবী নিজে পরমাত্মার স
একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন এবং সেই পরমাত্মার (নিজেরই) স্তুতি করিয়াছেন। ত
হইলে দেখা যাইতেছে যে, বেদ প্রতিপাদ্য পরমাত্মার স্তুতিতে তন্ত্র-প্রতিপাদ্য পরাশক্তি
হইয়াছেন। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে পরমাত্মা ও পরাশক্তি অভিন্নবস্তু। দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি
যে একই মহাসত্যের পরিচয়, ইহা দেবীসূক্ত প্রতিপন্ন করিতেছে।

দেবীসূক্তে আটটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটি এই—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামাহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মাহ
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১॥

আমি রুদ্র ও বসুরূপে বিচরণ করি। আমি আদিত্য ও বিশ্বদেব রূপে বিচরণ ক
আমি মিত্রাবরুণ (মিত্র ও বরুণ), ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

ওই মন্ত্রে রুদ্র ও বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেব, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি
অশ্বিনীকুমারযুগল, এই অষ্ট বৈদিক দেবতার কথা বলা আছে।

রুদ্র একাত্মাভিমুখী শক্তি—বসু বহুত্বাভিমুখী শক্তি। আমি রুদ্র, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমি একত্বের দিকে লইয়া যাই, সকল বহুত্বের বিলোপ সাধন করিয়া। আবি বসু, বহুত্ব-প্রকাশক শক্তিরূপে আমি নানা বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎ ব্যক্ত করি।

আদিত্য একত্বের ধারক, বিশ্বদেব বহুত্বের ধারক। ব্যক্ত বহুত্বকে আমি আদিত্যরূপে একক স্বরূপে ধারণ করি। আমি বিশ্বদেব, বহু হইয়া প্রত্যেকটি বস্তুতে পূর্ণরূপে বিরাজ করি।

মিত্র ও বরুণ, নীতি ও শৃঙ্খলার দেবতা। মিত্র বহির্জগতের শৃঙ্খলাকারী, বরুণ অন্তর্জগতের শৃঙ্খলাকারক। আমি মিত্র ও বরুণরূপে বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের শৃঙ্খলা সাধন করি। জড় ও চিৎ জগৎ আমার শক্তিতেই সুনিয়ন্ত্রিত আছে।

যে শক্তি বিরাজিত বা স্থিত আছে তাহা ইন্দ্র। যে শক্তি গতিমান্ হইয়া কার্য্য সাধন করে তাহা অগ্নি। আমি স্থিতিমান্ ও গতিমান্ (static & dynamic) উভয়বিধ শক্তিরূপে বিদ্যমান অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য্যমার্গ ও চন্দ্রমার্গের বিধানকর্ত্তা। তাঁহারা দিবা ও রাত্রিস্বরূপ, ইড়া ও পিঙ্গলাস্বরূপ। জগতের আলো অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ আমার শক্তিতেই বিধৃত।

চণ্ডীতেও দেবী বলিয়াছেন, "অহং বিভূত্যা বহুভিবিহ রূপৈর্যদাস্থিতা" (১০।৮), অর্থাৎ আমি ঐশ্বর্য্য দ্বারা বহু মূর্ত্তিতে অবস্থান করি। এই তত্ত্ব, গীতার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগে বিশেষ ভাবেই কথিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুন এক স্থানে সকল দেবতা দর্শন করিয়াছেন। একই মহাশক্তি বহু দেবশক্তিরূপে জগতে ক্রিয়াশীলা। দেবীসূক্তের প্রথম মন্ত্র এই সংবাদই বহন করিতেছে। দ্বিতীয় মন্ত্র এই—

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমূত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুম্বতে॥ ২॥

আমি শত্রুনাশক সোমকে ধরিয়া আছি, আমি ত্বষ্টা, পূষা ও ভগদেবকে ধারণ করি। যে যজমানের প্রচুর হবি আছে ও যাহা তিনি দেবোদ্দেশে অর্পণ করেন ও যিনি বিধিমত সোমাভিষেক করেন তাঁহাকে আমি যজ্ঞের ফল দান করি।

জীব ও জগতের মধ্যে নিরন্তর একটি ক্ষয় লাগিয়া আছে। এই ক্ষয়রূপ শত্রু হইতে রক্ষা করিয়া যে শক্তিসর্ব্বদা পুষ্টি বিধান করেন তিনি সোম। চিজ্জগতের পোষণকারী সোম, জড়জগতের পোষক পূষা প্রত্যেক ছোট বড় বস্তুকে তিনি তৎ তৎ রূপ দান করেন তিনি ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা। ভগদেব জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি সাধককে সাধনার যোগ্যফল প্রদান করেন।

এই সংসারে কাহারও হয়ত সম্পদ আছে, দাতৃত্ব নাই, কাহারও বা দানশীলতা স্বভাব কিন্তু তিনি দরিদ্র। যাহার আছেও প্রচুর এবং জগৎ-কল্যাণে দানও করেন প্রচুর, তাঁহার সার্থক জন্ম। সেইরূপ যে যজমান নিত্য বিধিমত ওজঃশক্তি সাধনা করেন, তাঁহাকে আমি তাঁহার প্রয়োজন অনুরূপ সম্পদ্ দান করি। যজমান যদি ভোগার্থী হয়, তাহাকে ভোগ দেই যদি স্বর্গার্থী হয়, স্বর্গ দেই; যদি মোক্ষার্থী হয়, তবে মোক্ষই প্রদান করিয়া থাকি। চণ্ডীগ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।।" ১৩।৫

এই দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইল যে, সেই মহাশক্তি কল্যাণময়ী মাতার সন্তানকে ক্ষয় হইতে রক্ষা করিয়া পোষণ করেন। তিনি সকল বস্তুকে রূপদান করেন ও যোগ্য সাধককে যথাযোগ্য ফল দান করেন। এক তিনি, বহু রূপ ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারে নিজেকেই নিজে পোষণ করেন।

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রে বলা যাইতেছে—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্তাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ।।৩।।

আমি রাষ্ট্রী, রাষ্ট্রের অধীশ্বরী। রাজ্যরক্ষার্থ যে সম্পদের প্রয়োজন আমি তাহার বিধানকর্ত্রী সংসারে শান্তিলাভের জন্য যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়োজন, আমি তাহাই জানি (চিকিতুষী)। আমি এক হইয়াও বহুরূপা। সর্ব্বজীবে আমি বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। দৈবী সম্পৎশালী দেবতাগণ যাহা সাধন করেন সকলই আমার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়।

"আকাশাৎ পতিতং তোয়াং যথা গচ্ছতি সাগরম্।"

আকাশ হইতে পতিত বর্ষাধারা যেমন শেষ পর্যন্ত সকলই সাগরে গমন করে, সেইরূপে সকল দেবতার অর্চ্চনাই এক পরম দেবতায় পর্য্যবসিত হয়। গীতাতেও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত যে দেবতার অর্চ্চনাই করুক, আমারই পূজা হয়। তবে সকলই একই পরমস্বরূপের প্রকাশ, ইহা জানিলে অর্চ্চনা যথাবিধি হয়। না জানিলে অবিধিপূর্ব্বক হয়।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইল যে, একই মহাশক্তি রাষ্ট্রশক্তিরূপে, ধনদাত্রীরূপে ও ব্রহ্মজ্ঞানরূপে বিরাজমানা। বহুরূপে তিনি প্রকাশমানা এই তত্ত্ব জানিয়া যেখানেই মস্তক অবনত করি তাঁহারসমীপেই পৌঁছানো যায়।

চতুর্থ মন্ত্র—

ময়া সে অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥ ৪॥

যে অন্নাহার করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণধারণ করে, যে বাক্য শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি আমাদ্বারাই ঐ সকল কর্ম সাধন করিয়া থাকে। আমার ঈদৃশ স্বরূপতত্ত্ব যাহারা জানে না তাহারা হীনদশা প্রাপ্ত হয়। শোনো হে যশস্বী বন্ধু! বহু সাধনালব্ধ যে বার্ত্তা তাহা তোমাকে বলিতেছি।

মনুষ্যদেহে যে সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয় তাহা সকলই এক মহাশক্তির কার্য্য। দেখাশুনা, আহার, প্রাণরক্ষা, যাবতীয় কার্য্যই একটি মহাশক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। চণ্ডীতেও বলা হইয়াছে, তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি (ইন্দ্রিয়াণ্যমধিষ্ঠাত্রী, ৫।৭৭)। দেহেন্দ্রিয়ের সকল শক্তির মূলাধাররূপে তাঁহাকে যাহারা জানে না, তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা জানেন তাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা থাকিলে এই তত্ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলা হইতেছে, ইহা নিবিষ্টভাবে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইল যে, কেবল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্যই যে তিনি করিতেছেন তাহা নহে; তোমার-আমার ক্ষুদ্র এই দেহভাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার সেই একই মহাশক্তি দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চালক ও আমার ক্ষুদ্র দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক যে একই মহাশক্তি, ইহা যিনি জানেন না তিনি দিনের পর দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন। সুতরাং ইহা জানাই কর্ত্তব্য।

পঞ্চম মন্ত্র—

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ।। ৫।।

আমি নিজে সেই কথা বলিতেছি, যাহা দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলে জানিবার জন্য যত্নপরায়ণ। যে যেমন কামনা করে তাহাকে তেমনটি আমিই করিয়া থাকি। ব্রহ্মাও আমি করি, ঋষিও আমি করি, জ্ঞানীও আমারই সৃষ্টি।

যে জ্ঞান লাভ না হইলে শান্তিলাভের উপায় নাই সেই জ্ঞান লাভের জন্য দেবতা ও মনুষ্য সকলেই সর্ব্বদা চেষ্টারত। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সকলেই ব্রহ্মানুসন্ধান করে। সাধনফলে তাহারা আমাকে জানে। জানিয়া আবার কথা বলে। আজ আমার স্বরূপকথা

আমি নিজেই বলিতেছি। ইহা আমার সাধনালব্ধকথা নয়—আমার নিজস্ব স্বরূপ-কথা, সুতরাং মনঃসংযোগ-সহকারে শ্রবণ করা উচিত।

যে যেরূপ কামনা করে সেরূপ ফল লাভ করে। কামনা বলিলে শুধু ইচ্ছা নহে, ইচ্ছার সহিত প্রযত্ন বুঝাইবে— wish নহে, will; যে যাহা পাইবার জন্য সাধনশীল, সে তাহা পায়—ইহা কেবল সাধনার ফল নয়, আমি কৃপা করিয়া দেই বলিয়া পায়। চেষ্টা করিবার ইচ্ছা ও শক্তিও আমি দেই, আবার ফলও আমিই দেই। সুতরাং আমিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাহাকে যাহা করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাই করি। ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ঋষিত্ব, মেধাবীর মেধা, সকলই আমারা কল্যাণী ইচ্ছার ফল।

পঞ্চম মন্ত্রে বলিলেন, জীবনের যাহা কিছু লভ্য সকলই মহাশক্তির প্রসাদে হইয়া থাকে। চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে—"সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না" (৪।১৫)। মা প্রসন্না হইলে সকল প্রকার অভ্যুদয় দান করেন। সেই মহাশক্তির কাছে আত্ম-নিবেদনেই জীবনের কল্যাণ। তাঁহার মহতী ইচ্ছার সঙ্গে ক্ষুদ্র ইচ্ছা মিলাইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধি মানুষের কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ মন্ত্র—

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ।। ৬।।

আমি রুদ্রের ধনুক জ্যা-যুক্ত করিয়া বিস্তার করি, যাহারা ব্রহ্মদ্বেষী তাহাদের নাশের জন্য। সজ্জনের রক্ষার্থ আমি যুদ্ধ করি। স্বর্গে মর্ত্তে সর্ব্বত্র আমি সংপ্রবিষ্ট হইয়া আছি।

যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করে তাহাদের পথের যাবতীয় বাধা আমি দূর করিয়া দেই। লয়কারী রুদ্রের ধনুকে জ্যা আরোপ করিয়া আমি সাধকের সাধনপথের অশেষ অনর্থ অপনোদন করি। যাহারা সাধক তাহাদের কল্যাণ করাই আমার ব্রত। এই মহাকল্যাণ শক্তিরূপে আমি বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমানা আছি।

ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইল যে, মহামঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপে তিনি সর্ব্বত্র আছেন। ভক্ত তাঁহার দিকে যাত্রা করিলে পথের সকল বাধা তিনি দূর করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লন। সুর বিরোধী আসুরিক শক্তি দমনে তিনি সর্ব্বদাই রত।

সপ্তম মন্ত্র—

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃসমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু* বিশ্বো
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥ ৭॥

সর্ব্বোপরি যে জগতের পিতা তাঁহাকেও আমি প্রসব করিয়াছি। পরম জ্ঞান-সমুদ্রের অভ্যন্তরে আমার যোনিস্থান। সর্ব্বভুবনে আমি অনুপ্রবিষ্ট। ভূলোকের ঊর্দ্ধে যে দ্যুলোক আছে, তাহাও স্থির আছে আমি স্পর্শ করিয়া আছি বলিয়া।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে প্রাধানিক রহস্য প্রকরণে উক্ত আছে মহালক্ষ্মী হইতে ব্রহ্মা ও শ্রী, মহাকালী হইতে রুদ্র ও ত্রয়ী এবং মহাসরস্বতী হইতে বিষ্ণু ও গৌরী উৎপন্না হইয়াছেন। পরে মহাশক্তি ব্রহ্মাকে ত্রয়ী, রুদ্রকে গৌরী ও বিষ্ণুকে শ্রী, পত্নীরূপে অর্পণ করিয়াছেন।

"ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপ ত্রয়ীং।
রুদ্রায় গৌরং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্।।"

এই সিদ্ধান্তে, প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবও মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন তাই দেবীসূক্ত বলিতেছেন, জগতের যে পিতা তাঁহাকেও আমি প্রসব করিয়াছি।

মায়ের যেটি জননস্থান, মূল গৌরীপীঠ, সেটি কোথায়, তাই বলিতেছেন, "অপ্‌সু অন্তঃসমুদ্রে", জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরে গূঢ়ভাবে নিহিত। উপনিষদ্ তাঁহাকে গূঢ়াত্মা বলিয়াছেন।

সেই গূঢ়বস্তুকে স্থূল বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় না। কঠোপনিষদের মন্ত্রে আছে —

"দৃশ্যতে অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।" (৩।১২)

সূক্ষ্মদর্শী অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারেন। সেই গূঢ় যোনিস্থান হইতে অনন্ত বিশ্ব উদ্ভূত। মা যে কেবল প্রসব করিয়াছেন তাহা নহে, প্রসূত সকল বস্তুতে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রুতি মন্ত্রে আছে—

"তং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

ভূলোক হইল স্থূল জগৎ, দ্যুলোক হইল সূক্ষ্মজগৎ; এই দুই স্থিত আছে কারণরূপিণী মহাশক্তি তাঁহার দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়া। তিনি ছুঁইয়া আছেন বলিয়াই নিখিল বিশ্ব ক্রিয়াশীল।

সপ্তম মন্ত্রে বলা হইল যে, মহাশক্তি সকল কারণে কারণস্বরূপিণী। তাঁহার কৃপাস্পর্শে নিখিল বিশ্ব জীবন্ত। মাতৃ অঙ্কে জগৎ সংসার বিধৃত।

অষ্টম মন্ত্রে—

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

ইতি ঋগ্বেদোক্তং দেবীসূক্তং সমাপ্তম্।

ভূলোক ভুবর্লোকাদি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিতে করিতে আমি তাহার উপর বায়ুর মত প্রবাহিত হই। মূলতঃ আমি ভূলোক দ্যুলোক সকলের ঊর্দ্ধে। আমি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাতীত, তথাপি নিজ মহিমায় জগন্ময়ী এই বিশ্বরূপধারিণী হইয়া আছি।

তিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বগ। একই কালে Transcendent ও Immanent, জগদতীত হইয়াও জগদ্রূপে সম্ভূত। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি", আবার "ন চ মৎস্থানি ভূতানি," আবার "ন চ মৎস্থানি ভূতানি।" কাহারও সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই—তবুও সকল সৃষ্টি করিয়া সকলের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কান্বিত হইয়া রহিয়াছেন দেবীসূক্তের অষ্টম মন্ত্রের ইহাই বার্ত্তা। সমগ্র দেবীসূক্ত এই সংবাদ দিল যে, উপনিষদের পরাৎপর ব্রহ্ম ও তন্ত্রশাস্ত্রের মহাশক্তি একই বস্তু।

পূজাতত্ত্ব

(ক)

মহাশক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। মাতার সহিত সন্তানের চির সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। মাতা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের কাছে আসিতেছেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ লইয়া, আমাদেরই তুষ্টি পুষ্টি বিধানার্থ তিনি আসিতেছেন। আর দুর্ভাগা সন্তান আমরা এমনই স্মৃতিভ্রষ্ট যে, তাঁহারই দেওয়া ধন ভোগ করিতেছি, তাঁহারই আদরে বর্দ্ধিত হইতেছি অথচ তাঁহাকেই লক্ষ্য করি না।

স্মৃতিভ্রংশরূপ অর্গলে আমাদের হৃদয়-দুয়ার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সহস্রবার মা আসিয়া ফিরিয়া যান, আমরা রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দেই না। এই রুদ্ধ দুয়ারকে খুলিবার যে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত নিরুপম উপায়, তাহারই নাম পূজা। মহাশক্তির সঙ্গে আমাদের বিস্মৃত সম্বন্ধটি পুনঃ স্থাপন প্রসঙ্গে সকল শাস্ত্রকারই কোনও না কোন উপায়ে সন্ধান দিয়াছেন। বৈদিক শাস্ত্র বলিয়াছেন যজ্ঞের কথা, তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন পূজার কথা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক ও তান্ত্রিক সভ্যতা যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তখন সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যজ্ঞ ও পূজা দুই-ই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। দু'য়ের মূল উদ্দেশ্য একই। গৌণ দৃষ্টিতে দু'য়ের উদ্দেশ্য কাম্যবস্তু লাভ। মুখ্য দৃষ্টিতে উভয়ের উদ্দেশ্য মুখ্য বস্তু ব্রহ্মপদ লাভ।

পূজার দুটি দিক্—একটি বাহিরের দিক্, সেটি বিজ্ঞানধর্ম্মী, অপরটি অন্তরের দিক্ সেটি আত্মধর্ম্মী। বাহিরের দিক্ হইতে পূজা একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থাবিশেষ (scientific technique)। অন্তরের দিক্ হইত পূজা একটি আত্মধর্ম্মী প্রেমপূর্ণ সমর্পণ বিশেষ। ইহা কেবল মাতৃরূপা মহাশক্তির নিকট পৌঁছাইবার পথ মাত্র নয়। মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিয়া মাতৃত্বের স্নিগ্ধতার আনন্দে পূর্ণ হওয়াও পূজারই ফল। পূজা নিম্নাধিকারীর জন্য, এই মত তন্ত্র পোষণ করেন না। মায়ের কাছে যাইবার ও তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় পূজা। ইহাতে অনধিকার কাহারও নাই।

পূজার অনুষ্ঠানগুলির মূল বৈজ্ঞানিক। মনে করুন, আপনার গৃহে উৎসবানুষ্ঠান। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় গৃহপ্রাঙ্গণ সজ্জিত। হঠাৎ সকল আলো নিভিয়া গিয়া বাড়ী ঘর আঁধার করিয়া দিল। আপনি পথ চাহিয়া দেখিলেন, রাজপথ ও পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর আলোকে উদ্ভাসিতই আছে। আপনার বুঝিতে বাকী রহিল না যে আপনার বাড়ীর সঙ্গে মূলকেন্দ্রের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী ডাকিলেন। তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্ঘণ্ট

দিলেন। আপনি আনাইয়া দিলে তাঁহারা দুই-দশ মিনিট খাটিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেলেন। পূজা ব্যাপারটিও এইরূপ দুই -দুইয়ের যোগে চার হওয়ার মত।

জগতের সকলেই শক্তিমান্। আপনি শক্তিহীন কেন? তন্ত্রশাস্ত্র উত্তর দিবে—আপনি শক্তির মূল কেন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ হারাইয়াছেন। আবার সম্বন্ধ স্থাপন করুন। উপায় কি? উপায় পূজা। পূজায় কি লাগিবে? পুরোহিত ঠাকুরকে সংবাদ দিন—তিনি আসিয়া ধান, মান, কলা, কচুর নির্ঘণ্ট দিবেন। যথাযথ দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা হউক। শক্তির আলো জ্বালিয়া উঠিবে। মাকে আবার পাইবেন। নিশ্চয়ই পাইবেন, গল্প নহে। শত সহস্র প্রমাণ আছে।

শ্রীগীতায় যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি পরম শ্লোক আছে—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" ৪।২৪

যজ্ঞের সবই ব্রহ্মময়। অগ্নিও ব্রহ্ম, হবনীয়ও ব্রহ্ম, অর্পণও ব্রহ্ম, হবনক্রিয়ার কর্ত্তাও ব্রহ্ম। জ্ঞানী এই প্রকার সমস্ত ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

পূজা সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ ভাবনা প্রয়োজন। পূজার সকল উপকরণই ঈশ্বরময়। পূজার পূর্ব্বে প্রত্যেকটি উপচারকে শুদ্ধ করতঃ অর্চ্চনা করিয়া ঈশ্বরময় করিয়া লইতে হয়। এমন কি, যে পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা হইবে, তাহাকেও অর্চ্চনা করতে হয়। পুষ্পকে অর্চ্চনা করিয়া "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া ফুলগুলি তাহার অধীশ্বর বিষ্ণুময়, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধিকাল পূজক, পূজ্যদেবতার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া যায়।

পূজার আন্তর দিক্‌টি হইল সমর্পণের কথা। চন্দনমাখা পুষ্প দেবতার পায়ে সমর্পণ করি। মূলে ওটি অনুরাগমাখা আত্মদান। ওটি দিতে দিতে ক্রমে জীবনটিই পূজাময় হইয়া উঠে। শেষে জীবনের সকল কর্ম্মই তাঁহার পূজায় পরিণত হয়।

"যৎ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।" যে যে কর্ম্ম করি সকলই তোমার আরাধনার্থ। এই পূজার প্রধান উপচার ভক্তি। ভক্তিবশ ভগবান্। ভক্ত ভক্তি করিয়া তাঁহাকে যাহা অর্পণ করে তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণ। ঐ দানে তিনিও সর্ব্বাধিক সুখী। পূজায় আর একটি প্রয়োজনীয় বস্তু, মন্ত্র। মন্ত্রতন্ত্র বিশ্লেষণে তন্ত্রশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের রাজা। মন্ত্র শব্দের অর্থ হইল "মননাৎ ত্রায়তে"—যে বস্তু মনন করিতে করিতে ত্রাণ পাওয়া যায়। মন্ত্র বলিতে ভগবন্নাম—ভগবদ্-বোধক শব্দ। বেদের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী। তন্ত্রশাস্ত্র বহু দেবতার বীজমন্ত্রের দ্রষ্টা। তন্ত্রমতে প্রত্যেকেরই ইষ্টদেবতার বীজ প্রণবতুল্য। প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম। দেবতার মন্ত্রের বাচ্য দেবতা। তত্ত্ববিচারে ব্রহ্ম ও দেবতায় ভেদ নাই। বেদশাস্ত্রে আছে—

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

একই সদ্বস্তুকে পণ্ডিতগণ বহু নামে বলিয়া থাকেন। সুতরাং নিজ ইষ্টমন্ত্র, প্রণবের সঙ্গে অভিন্নই।

মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বস্তু অভিন্ন। চণ্ডী বলিয়াছেন—মাকে লক্ষ্য করিয়াই—

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥" ১।৭৩

হে নিত্যে, হে অক্ষরে, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই বষট্কার ও স্বরস্বরূপিণী। তুমি অমৃতরূপা ও ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা। অর্থাৎ তুমি ও প্রণব অভিন্ন।

মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতা যে অভিন্ন, ইহার অনুভূতি হয় মন্ত্রের চৈতন্য হইলে। জপ করিতে করিতে মন্ত্রচৈতন্য হয়। তেঁতুল বলিতেই যদি রসনায় জল আসে, তবে বুঝিতে হইবে যে তেঁতুল শব্দের চৈতন্য হইয়াছে। কালিকার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতেই যদি নৃমুণ্ডমালিনী বরাভয়করা দেবীর উদয় হয় তবে বুঝিতে হইবে এই বীজের চৈতন্য হইয়াছে।

মন্ত্রাক্ষরের একটি নিজস্ব শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই সে কার্য্য করে। অভিন্ন যে তৎপ্রতিপাদ্য বস্তু, তাহাকে টানিয়া আনে। এইটি মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক দিক। আবার ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতাযুক্ত মনঃপ্রাণ লইয়া মন্ত্র উচ্চারণে মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এটি মন্ত্রের আধ্যাত্মিক দিক্। মন্ত্রের শক্তিও কার্য্য করিবে—জাপকের ভক্তিও কার্য্য করিবে। শক্তি হৃদয়ে জাগিলে, তবে ভক্তিকে জাগাইবে। ভক্তি শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

মেধা ঋষি মাতৃদর্শন লাভের জন্য সুরথ-সমাধিকে পূজাই করিতে বলিয়াছিলেন—

"তামুপেহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।।" ১৩।৪-৫

ঋষির আদেশে সমাধি ও সুরথ রাজা পূজা করিয়া মহাশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যে ভাবে পূজা করিয়াছিলেন উহাই তন্ত্রোক্ত পূজার বিশিষ্টরূপ। তাঁহাদের পূজার কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

"সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।।
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।।
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।।"

(উত্তর চরিত, ১৩/৯-১২)

অম্বিকার দর্শনের জন্য বৈশ্য নদীপুলিনে গিয়া দেবীসূক্ত জপ করিলেন। নদীর পুলিন তপস্যার অনুকূল স্থান। কোন্ স্থান পূজার যোগ্য সে সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বহু নির্দ্দেশ আছে।

বিল্বমূল, তুলসীকানন, দেবায়তন, গুরু -সন্নিধান, যেখানে চিত্তের সহজে একাগ্রতা হয়। এই সব বহু কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বেষামুত্তমং প্রোক্তং নির্জ্জনং পশুবর্জ্জিতম্।"

তৎপরে দেবীসূক্ত জপ করিলেন। দেবীর এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রাক্ষরের পুনঃপুনঃ উচ্চারণকে জপ কহে। "জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তিঃ।" গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"

তন্ত্রশাস্ত্র কহিয়াছেন "জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।" মন্ত্র-জপের পদ্ধতি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তর কথা আছে।

মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তম্।
অব্যগ্রত্বমনির্ব্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ ॥

বৈষয়িক চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া শুচিভাবে মৌনভাবে মন্ত্রের অর্থ চিন্তাসহ ব্যগ্রতাশূন্য হইয়া মনে কোন প্রকার দুঃখভাব না রাখিয়া জপ করাই সিদ্ধিলাভের হেতু।

পতঞ্জলিও কহিয়াছেন "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" জপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রার্থের ধ্যান করিবে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, প্রথমে ধ্যান তৎপর মন্ত্রজপ করিবে। পরে ধ্যানান্তেও মন্ত্র জপ করিবে—

আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্রং ধ্যানস্যান্তে পুনর্জপেৎ।
ধ্যানমন্ত্রসমাযুক্তাঃ শীঘ্রং সিধ্যন্তি সাধবঃ ॥

মন্ত্রসঙ্গে মন্ত্রার্থের চিন্তা, মন্ত্রপতিপাদ্য দেবতার ধ্যান, বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধ্যান ও মন্ত্র সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়।

তারপর তাঁহারা নদীতীরে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, হোম ও তর্পণ দ্বারা মায়ের পূজা করিয়াছিলেন।

অনেকেই মনে করেন বেদে মূর্ত্তিপূজার কথা নাই। আর্য্য-সমাজীরা খুব জোর করিয়াই একথা বলেন। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবপূজা ভারতীয় দৃষ্টিতে তন্ত্রশাস্ত্রেরই মহাদান।

পূজাতত্ত্ব

(খ)

"কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্"
(শ্রীচণ্ডী, ১৩।১০)

মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য। ঋষির আদেশে ও নির্দ্দেশেই তাঁহারা পূজা করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি যে মৃন্ময়ী হইয়াছিল একথা চণ্ডীতে সুস্পষ্ট।

প্রতীক অবলম্বনে ভগবদর্চ্চনা হিন্দু সংস্কৃতিতে তন্ত্র-শাস্ত্রের অতুলনীয় দান। বেদশাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। "ন তস্য প্রতিমা বাস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" ইত্যাদি অনেক বৈদিক উক্তি প্রতিমা অর্চ্চনের অপক্ষপাতী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সুম্বন্ধে স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় বৈদিক মতে "যজ্ঞ" এবং তান্ত্রিক মতে "পূজা"।

যজ্ঞে মূর্ত্তির আবশ্যকতা থাকে না। অগ্নিকে সকল দেবতার মুখ ভাবনায় (অগ্নিমুখা বৈ দেবতাঃ) একমাত্র অগ্নির মাধ্যমেই সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-দ্রব্যাদির সমর্পণ চলে। পূজায় কিন্তু প্রতিমা অপরিহার্য্য। ঈশ্বরের সঙ্গে কুটুম্বিতাকে অন্তরঙ্গ ও প্রগাঢ় করিতে হইলে অর্চ্চনাই সর্ব্বাধিক শক্তিশালী একথা ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ আচার্য্যগণেরও অনুমোদিত তথ্য।

কোন কোন আচার্য্য "অরুন্ধতী-ন্যায়" অবলম্বনে প্রতীক পূজার সার্থকতা স্থাপন করে। আকাশের উত্তর ভাগে সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে যে নক্ষত্রগুলি আছে উহার মধ্যে একটি নক্ষত্রের নাম হইল বশিষ্ঠ। ঐ বশিষ্ঠের পার্শ্বে অরুন্ধতী বিদ্যমান। অরুন্ধতী অত্যন্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্র। তাহাকে চিনাইতে হইলে আগে বশিষ্ঠকে দেখাইতে হয়। বশিষ্ঠ পরিচিত হইলে অরুন্ধতীকে পাওয়া অতি সহজ হইয়া পড়ে। পণ্ডিতেরা ইহাকে "অরুন্ধতী-ন্যায়" বলেন। এই ন্যায়টির তাৎপর্য্য হইল, সূক্ষ্মবস্তু সম্বন্ধে অবগতির জন্য স্থূল বস্তুর সাহায্যাপেক্ষা। পরমতম বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার জন্য, স্থূল বস্তুর অপেক্ষা, ইহাকেই বলে প্রতীকোপাসনা। প্রতীক-রূপেই মূর্ত্তিপূজার প্রয়োজনীয়তা। স্থূলবুদ্ধি প্রবর্ত্তকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর উপায় আর কি হইতে পারে?

ভগবদ্‌বিগ্রহ প্রতীক বটে কিন্তু ইহাই মূর্ত্তি সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। সাধনা-যাত্রার প্রারম্ভে শ্রীমূর্ত্তি হইতে পারে কিন্তু সাধনের পরিণতিতে উহা চিন্ময় সত্তা। প্রতীক-রূপতার

চিন্ময় রূপত্বে পরিণতি হইলেই পূজা সার্থক হয়। যিনি একদিন ছিলেন অপরিচিত লোক—তাঁহারই সঙ্গে যেমন বহু মেলামেশার পরে তিনি হইয়া ওঠেন পরম বন্ধু—সেইরূপ প্রতীক-রূপে যে মূর্ত্তির হয় প্রতিষ্ঠা, ভক্তের অর্চ্চনার ফলে তিনিই হইয়া যান চিদ্‌বিগ্রহ—সাক্ষাৎ ভগবান্—আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষায় "অর্চ্চাবতার"।

আচার্য্য রামানুজের নিকট একদা জনৈক মূর্ত্তি-পূজায় আস্থাহীন ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য আপনি ছোট ছোট কতগুলি পিতলের মূর্ত্তি রাখিয়াছেন কেন?" আচার্য্য বলিলেন, "আমার ধুনী জ্বালাইবার জন্য আগুনের প্রয়োজন, আপনি গ্রাম হইতে আমাকে একটু আগুন আনিয়া দেন, তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।" ঐ লোকটি আগুন লইয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য বলিলেন, "আপনি এক খণ্ড দগ্ধ কাষ্ঠ আনিয়াছেন কেন? যাহা কহিয়াছি ঠিক তাহাই আনুন। আগুন কহিয়াছি, আগুনই আনুন। আগুন সকল বস্তুর মধ্যেই আছে। আপনার হাত ঘসিয়া দেখুন হাতের মধ্যেও আগুন আছে। আপনি আমার জন্য একটু খাঁটি আগুন আনুন—পোড়া কাষ্ঠ চাই না।"

আচার্য্যের কথা শুনিয়া লোকটি উত্তর কহিল, "অগ্নি আছে সকল বস্তুর মধ্যেই কিন্তু আপনার নিকট আনিতে হইলে দগ্ধকাষ্ঠ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখিতেছি না।" তখন আচার্য্য গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সকল বস্তুতে নিহিত অগ্নিকে আমার নিকট আনিতে যেমন দগ্ধকাষ্ঠ আহরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় আপনি দেখেন না—আমিও সেইরূপ সর্ব্বভূতস্থ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে আমার নিকটতম করিয়া আনিতে চাহিলে মূর্ত্তিতে আরোপ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পাই না। আপনার হাতের কাঠখানি আগে ছিল কাঠ, উহাতে অগ্নি ধরিলে উহা হইয়াছে অগ্নি। আমার নিকটস্থ এই ঠাকুরটি এক সময় ছিলেন পিতল-নির্মিত মূর্ত্তি, কিন্তু এখন ইহা চিন্ময় পরব্রহ্ম, ইহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। নারায়ণ যেমন অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন রামরূপে, তিনি আজ আমার দুয়ারে যেমন আসিয়াছেন এই অর্চ্চাবতাররূপে।"

আচার্য্যের উক্তিতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। বিগ্রহরূপে ভগবদর্চ্চনা, তন্ত্রশাস্ত্রের এই বিরাট দানকে শাস্ত্রকারগণ ও আচার্য্যগণ মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

> "য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
> বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্।।
> লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যং তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
> মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ।।" (১১।৩।৪৭-৪৮)

হৃদয়ের গ্রন্থিকে ছেদন করিতে যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে

কেশবকে অর্চ্চনা করিবে। গুরুর নিকট হইতে আগমোক্ত পথ ও তাঁহার কৃপারূপ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া পরে অভীষ্ট মূর্ত্তিতে মহাপুরুষের অর্চনা করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের নববিধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনা একটি প্রধান অঙ্গ। নারদপঞ্চরাত্র, নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও পূজা, বিশেষ একটি ভজনাঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, সনাতন গোস্বামিপাদকে শিক্ষা দিতে চৌষট্টি-অঙ্গ ভজনের কথা কহিয়াছেন। তন্মধ্যে পাঁচটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। সেই প্রধান পঞ্চাঙ্গের মধ্যে অন্যতম "শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন"। বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ ছাড়া ভারতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই পূজাঙ্গের অপরিহার্য্যতা স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদী সাধকেরাও চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্ব পর্যন্ত পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা আবশ্যক মনে করেন।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠারূঢ়, ব্রহ্মবস্তুও সেই প্রকার মূর্ত্ত্যারূঢ়। সুতরাং মূর্ত্তি যে কেবল অরুন্ধতী-ন্যায়ে ব্রহ্মবস্তুকে চিনাইয়া দিবার উপায় মাত্র, তাহা নহে। উহাতে উপাস্যের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ঘটে। বিগ্রহে বিরাজমান থাকিয়া তিনি ভক্তদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কার্য্যটি সাধিত হয় ভক্তের ভক্তি এবং মন্ত্রের শক্তির বলে।

তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন—গাভীর দুগ্ধ তাহার রক্ত হইতে সমুদ্ভুত। রক্ত গাভীর সর্ব্বাঙ্গেই বিরাজিত। তাই বলিয়া গাভীর যে কোন অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেই দুগ্ধ পাওয়া যায় না। একমাত্র স্তন হইতেই উহা ক্ষরিত হয়। সেইরূপ শ্রীভগবানের উপস্থিতি সর্ব্বত্র সকল সময়ে থাকিলেও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি প্রতিমাতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে হইয়া থাকে।

সুতরাং মূর্ত্তি কেবল দেবতার প্রতিনিধি নহেন। ঐ মূর্ত্তিই দেবতা। পূজার অঙ্গগুলি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে বিগ্রহে দেবতা মূর্ত্তিমতী হইয়া ভক্তের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করেন, ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অষ্টপ্রকার বিগ্রহের কথা কহিয়াছেন।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।।" (১১।২৭।১২)

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী সুবর্ণাদিময়ী (লৌহী), মৃৎচন্দনাদিময়ী (লেপ্যা), চিত্রপটময়ী (লেখ্যা), বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই আট প্রকারের প্রতিমা হইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মনোময়ী প্রতিমাকেও একপ্রকার প্রতিমা বলা হইয়াছে। চক্ষু নিমীলন করিয়া মানসে যদি তাঁহার মূর্ত্তি ভাবনা অর্চ্চনা করে, তাহা হইলেও প্রতিমা পূজা করা হইল। যাঁহারা প্রতিমা পূজার বিরোধী, কথাটি তাঁহাদের ভাবিবার মত। মূর্ত্তি (image) ছাড়া মন ভাবিতে পারে না—এই তথ্য বর্ত্তমানে মনোবিজ্ঞান-সম্মত। মনকে সঙ্গে নিলেই সে প্রতিমা তৈয়ারী করিবে। সুতরাং যাঁহারা প্রতিমা পূজার বিরোধী তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে হইবে—মনকে বাদ দিয়া। মনকে বাদ দিলে উপাসনা করিবে কে?

মনোভূমির ঊর্দ্ধে শুদ্ধ চিদ্‌ভূমিতে— যেখানে উপাস্য উপাসক উপাসনা একাকার হইয়া যায়— সেখানে উপাসনাও নাই, প্রতিমাও নাই। কিন্তু উপাসনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রতিমা চাই-ই।

অনেকে মনে করেন প্রতিমায় দেবার্চ্চনা নিতান্ত অজ্ঞ, অনধিকারী গ্রাম্য নরনারীর জন্য, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য নহে। কিন্তু একথা নিতান্তই অসার। পূজা কার্যটি এতই কঠিন যে, মহা মহা পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পূজা সম্পাদনে অক্ষম। পূজার উপাচারসমূহের মধ্যে পূজকের মন একটি সর্ব্বপ্রধান বস্তু। মনটিকে তৈয়ারী না করিলে অন্য সকল সম্ভারের প্রাচুর্য্য থাকিলেও পূজা হইবে না। আর মনটি যদি লুব্ধ ভ্রমরের মত ইষ্টের পাদপদ্মে লাগিয়া যায় তাহা হইলে উপচারহীন পূজাও কল্যাণদায়ক হয়। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য কিভাবে মাতৃপূজার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীচণ্ডী গ্রন্থ অবলম্বনেই স্মরণ করা যাইতেছে—

"নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।।" ১৩।১১

আদৌ যতাহারৌ অল্পাহারৌ ততো নিরাহারৌ। প্রথমতঃ আহার সংযমপূর্ব্বক অল্পাহারী হইয়াছিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে একেবারেই আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আহার বলতে কেবলমাত্র মুখদ্বারা খাদ্য গ্রহণকেই বুঝায় না, কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বিষয় গ্রহণও আহার পদবাচ্য। সুতরাং বোঝা গেল যে, সুরথ এবং সমাধি পূজকদ্বয় চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা বহির্জ্জগৎ হইতে রূপ-শব্দটি গ্রহণ করাও বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন— শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ভজনোন্মুখ কোন ব্যক্তিকে লিখিয়াছিলেন—"কায়মনে মনুষ্যবিষয় গ্রহণ করিও না।" মায়ের পূজকদ্বয় সেইরূপ কায়মনে জাগতিক বিষয় গ্রহণ বর্জ্জন করিয়া দিয়াছিলেন।

'নিরাহারৌ যতাহারৌ' বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় সংযমের কথা বলিয়া 'তন্মনস্কৌ' পদে অন্তরিন্দ্রিয় মনঃসংযমের কথা বলিতেছেন। একমাত্র জগন্মাতাতেই যাঁহাদের মন নিবিষ্ট তাঁহারাই তন্মনস্ক। বস্তুতঃ মনটি সর্ব্বতোভাবে ইষ্টচিন্তায় দিয়া তন্মনস্ক হইতে পারিলেই নিরাহার হওয়া সম্ভব। অন্তর-সংযমই বহিঃসংযমের জনক। অন্তরে ইষ্ট-ধ্যান নাই, অথচ বহিরিন্দ্রিয়সংযম—ইহা কৃত্রিম। গীতশাস্ত্র উহাকে মিথ্যাচার বলিয়াছেন।

মনটি দেবীর চরণে অর্পণ করিয়া বহিরিন্দ্রিয়গণকে বহির্বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া 'সমাহিতৌ' হইয়াছিলেন। 'সমাহিতৌ' শব্দের অর্থ কেহ বলিয়াছেন "ত্যক্তবাহ্যচেষ্টৌ", তাঁহাদের বাহ্যচেষ্টা ছিল না। কেহ কেহ বলেন, সমাহিতৌ অর্থে গুরুপদিষ্টার্থে সাবধানৌ, নিরস্তসংশয়ৌ, বহুবিঘ্নপরিহারপরৌ নিয়মপরায়ণৌ। তাঁহারা ছিলেন গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়ে সাবধান সতর্ক, পাছে তাঁহাদের ভজনে কোন্ প্রকার ছিদ্র থাকে ও

ফললাভে বাধা ঘটে। গুরুবাক্যকে সত্যরূপে গ্রহণ করায় তাঁহাদের চিত্তে কোন সংশয় ছিল না। গীতাশাস্ত্র, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" বলিয়াছেন, চিত্তে সংশয় থাকিলে সকল ভজন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ভজন-পথে যতপ্রকার বিঘ্নবাধা উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া ঐ পথে চলিতেই দৃঢ়সংকল্প। যেরূপ নিয়ম করিয়া তাঁহারা প্রত্যহ উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই সব নিয়মের প্রতি তাঁহাদের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। কোন কারণেই নিয়ম-শৃঙ্খলার পথ হইতে তাঁহারা ভ্রষ্ট হন নাই। এই সকল কথাই 'সমাহিত' শব্দ দ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল তাঁহারা "শরীরং বা পাতয়ামি মন্ত্রং বা সাধয়ামি" এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাতৃপূজার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তাঁহারা মাতাকে উপহার (বলি) দিতেন স্বদেহ-শোণিত দ্বারা অভিসিঞ্চিত করিয়া। "দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।" তৌ সুরথবৈশ্যৌ নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতং তপশ্চরণকালে পরহিংসা-পরান্মুখত্বাৎ স্বশরীরোদ্ভব-রক্তমেব অন্নময়ং বলিঞ্চ দততুঃ, তপস্যা আচরণ করিবার কালে পরহিংসা করা অন্যায়, এই হেতু তাঁহারা নিজ গাত্র হইতে রুধির এবং অন্নময় চরু প্রভৃতি দ্রব্য মাতাকে প্রদান করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রকার বলেন—নিজদেহ হইতে রুধির দিলে দেবী সহস্রগুণ তুষ্ট হন।

"সহস্রং তর্পিতা দেবী স্বদেহ-রুধিরেণ বৈ।"

সকল বলির শ্রেষ্ঠ বলি নিজ অহংকার-বলি। স্বদেহ-শোণিত-দান আত্মবলিদানের একটি প্রকৃষ্ট প্রতীক। অহংকার সমর্পণের ওইটি স্থূলরূপ।

"বলিদানেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠ আত্মবলিঃ স্মৃতঃ।"

আমাদের অন্তঃকরণরূপ পশুর "চিত্তাহংকৃতি-বুদ্ধিমানসময়ৈঃ" চারি পদ। চিত্ত অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই চারি চরণে অন্তঃকরণ-পশু বিচরণ করে। এ পশুকে মায়ের চরণাম্বুজে যে ভক্ত বলিদান করেন, অণিমাদি অখিলসিদ্ধি তাঁহার চরণে লুটাইতে থাকে। ঐ পশু বধ করিবার অস্ত্র হইল বোধরূপ পরশু অর্থাৎ জ্ঞানরূপ কুঠার। এই পশুৎসর্গই প্রকৃত বলিদান।

এইভাবে তাঁহারা তিন বৎসর মায়ের আরাধনা করিয়াছিলেন।

"এবং সমারাধয়তো স্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।"

যতাহার, নিরাহার হইয়া একান্ত মনে সমাহিতচিত্তে নিজদেহজ শোণিতে মায়ের তুষ্টি বিধান করতঃ নিজেকে সর্ব্বতোভাবে মায়ের চরণে সমর্পণ করতঃ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহারা পূজা ও দেবীসূক্ত জপ করিতে লাগিলেন দীর্ঘ তিনটি বৎসর। তারপর—

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।"

জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা ভক্তদ্বয়ের সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রকটীভূতা হইয়া কথা বলিলেন। মাতাকে তাঁহারা কিরূপ দেখিলেন তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বর্ণনা দিয়াছেন—

"স দদর্শ পুরো দেবীং গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাম্।
তেজঃস্বরূপাং পরমাং সগুণাং বরাম্॥
দৃষ্ট্বা তাং কমনীয়াঞ্চ তেজোমণ্ডলমধ্যতঃ।
স্বেচ্ছাময়ীং কৃপারূপাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্।।"

গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের মত প্রভাময়ী মাকে তিনি দেখিলেন। মা তেজঃস্বরূপা, পরমা সগুণা গুণাতীতা— তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থা অতীব কমনীয়া। মা স্বেচ্ছাময়ী কৃপাঘনমূর্ত্তি, আর ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিবার কাতরস্বভবা।

যথাযথ পূজাদ্বারা মহাশক্তিরূপিণী মা প্রত্যক্ষা হন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পূজাঙ্গকে উপেক্ষা না করিয়া আসুন আমরা সকলে অন্তরে ভক্তিচন্দন ও করে পুষ্পস্তবক লইয়া মাতৃচরণে অঞ্জলি দিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকি—মা! মা!!

অকাল-বোধন

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরণন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।"

দেবতা ও মানুষ। ইহাদের মধ্যে ভেদ বহুবিধ। তন্মধ্যে একটি হইল দিন ও রাত্রির পরিমাপে। মানুষের দিন বারো ঘণ্টায়, রাত্রি বারো ঘণ্টায়। দেবতার দিবা ছয় মাস, রাত্রি ছয় মাস। আমাদের মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস এই ছয় মাস দেবতাদের দিন, শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস দেবতাদের রাত্রি। দেবতাদের দিনকে বলে উত্তরায়ণ, রাত্রিকে বলে দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত, দক্ষিণায়ন তাঁহারা নিদ্রিত।

শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়নের মধ্যে দেবী ভগবতী তখন নিদ্রিতা। সেইজন্য তখন তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে দেবীর জাগরণের জন্য বোধন করিতে হয়। বসন্তকাল পড়ে উত্তরায়ণের মধ্যে তখন দেবী জাগরিতা থাকেন। তাই জন্য বাসন্তী পূজায় বোধনের আবশ্যক হয় না। শারদীয়া পূজা, অকাল পূজা। বাসন্তী পূজা, কাল-বোধিত পূজা। অকাল হইলেও, পূজা বলিতে শারদীয়া মহাপূজাকেই বুঝায়।

মহারাজ সুরথ করিয়াছিলেন বাসন্তী পূজা। শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছিলেন শারদীয়া পূজা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে—

"পূজিতা সুরথেনাদৌ দেবী দুর্গতিনাশিনী।
মধুমাস-সিতাষ্টম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্ব্বকম্।।"

আদিতে সুরথ রাজা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, চৈত্রমাসে শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রবিধিমতে। সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য দুই জনে একত্র হইয়া এই পূজা করিয়াছিলেন ঋষির আদেশে। ঋষি বলিয়াছিলেন—

"তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।" (চণ্ডী-১৩।৫)

"হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণ লও, যিনি আরাধিতা হইলে, মানুষকে ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন।"

মায়ের অর্চ্চনা করিয়া সুরথ রাজা ভোগ ও স্বর্গ পাইয়াছিলেন, আর সমাধি বৈশ্য, মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বাসন্তী পূজার কাহিনী মূল চণ্ডীতে সংক্ষেপে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে অকাল-বোধন করিয়া জগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। সেই পূজাই জগতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কথা বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত হয় নাই। দেবীভাগবত ও কালিকাপুরাণে শ্রীরামের পূজার কথা বিশেষভাবেই কথিত হইয়াছে।

অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেবতারা শ্রীরামের মঙ্গল চিন্তায় মহাভাবনায় পড়িলেন। তাঁহারা সকলে স্থির করিলেন রামের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবেন। তাঁহারা গিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ চাহিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, আদ্যাশক্তির কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত রাবণ-বধ সম্ভব নহে। কিন্তু দেবী তো এখন নিদ্রিতা। তাঁহাকে আমরা প্রবোধিত করিব। কিন্তু কিভাবে যে প্রবোধিত করিব, তাহাও জননীর নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে।

দেবতাগণ ব্রহ্মার সহিত দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবীর কৌমারী মূর্ত্তি আবিভূর্তা হইলেন। কৌমারী রূপের বর্ণনা শ্রীচণ্ডীতেই পরিদৃষ্ট হয়—

"ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেহনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্তুতে তে।।"

কৌমারীদেবী কুমার কার্ত্তিকেয়ের শক্তি। তিনি শ্রেষ্ঠ ময়ূরের উপর সমাসীনা, মহাশক্তিধারিণী নিষ্পাপা। তিনি প্রকটীভূতা হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—"আপনারা আগামী কল্য বিল্ববৃক্ষমূলে জননীর বোধন করিবেন। আপনাদের প্রার্থনায় তিনি বোধিতা হইবেন। জগন্মাতাকে প্রবুদ্ধা করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

ব্রহ্মা মর্ত্ত্যে আসিলেন। একটি নির্জ্জন স্থানে একটি বিল্ববৃক্ষ দর্শন করিলেন। তাহার সবুজ ঘন পত্ররাশির মধ্যে কাঁচা সোনার বর্ণ একটি মনোহারিণী বালিকাকে বিনিদ্রিতা দর্শন করিলেন। ইনি জগজ্জননী ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া ব্রহ্মা সেখানে দেবগণ সহ নতজানু হইয়া বোধনস্তব করিলেন।

এই স্তবটি একট অষ্টক—আটটি মন্ত্র আছে। আদি ও অন্ত্যের দুইটি মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে।

"জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশীং
ক্রীড়াস্থানে স্বাগতাং ভূতলেহস্মিন্।
শত্রুস্ত্বং বৈ মিত্ররূপা চ দুর্গে
দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেহপি।।"

মহাদেবি! তুমিই যে মহেশ্বরী ইহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি। ভূতল তোমার ক্রীড়াভুমি, তাই তুমি এখানে আগমন করিয়াছ। তুমি শত্রুরূপাও বটে, মিত্ররূপাও বটে। বন্ধনকারিণীরূপে তুমি শত্রু; বন্ধমোচনকারিণীরূপে তুমি মিত্র। মহাযোগিগণ ধ্যানযোগে অন্তরেও তোমাকে ধরিতে পারেন না।

"ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা
রুদ্রেন্দ্রাদৌ ময্যপীহাস্তি যা চ।
সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত্ত
তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ।।"

যেখানে যে শক্তির ক্রিয়া সকলই তোমার। আমি ব্রহ্মা, আমার শক্তিও তোমার। রুদ্রদেবতা, ইন্দ্রদেবতা সকলের শক্তিই তোমার, তুমি সর্ব্বশক্তিরূপিণী। রাম-রাবণের যুদ্ধে, রামের শক্তিও তোমার, রাবণের শক্তিও তোমার। আমরা কায়মনে প্রার্থনা করি, তুমি সকল শক্তি লইয়া শ্রীরামচন্দ্রে প্রবর্ত্তিতা হও। অর্থাৎ সমগ্র শক্তি দ্বারা তুমি শ্রীরামকে সাহায্য কর। জননী, তুমি জাগরিতা হও, এই জন্য বোধন করিতেছি।

ব্রহ্মার স্তবে মহাদেবী প্রবুদ্ধা হইলেন। তিনি তখন তাঁহার বালিকা মূর্ত্তি ছাড়িয়া চণ্ডিকা-রূপে ব্যক্ত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "মাতঃ, আমরা অকালে তোমাকে ডাকিয়াছি, রাবণবধে শ্রীরামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।" দেবি, অদ্য হইতে আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করিব, যাবৎ না রাবণের বধ হয়। "রাবণস্য বধং যাবদর্চ্চয়িষ্যামহে বয়ম্।" আমরা যেভাবে বোধন করিয়া তোমার অর্চ্চনায় ব্রতী, সেই প্রকারে যুগ যুগ ধরিয়া সমস্ত নরনারী "যাবৎকালে সৃষ্টি প্রবর্ত্ততে" যাবৎকালে সৃষ্টি থাকিবে, তাবৎ কাল তোমার পূজা করিবে। তুমি কৃপা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ব্বশক্তি দিয়া রাবণ-বধে সহায়ক হও।

সদ্যঃপ্রবুদ্ধা দেবী কহিলেন, "আমি সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য ধনুর্ব্বাণে প্রবেশ করিব। অষ্টমীতে রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ হইবে। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মাথা মাটিতে লুটাইবে। দশমীতে শ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব করিবেন।"

বোধন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত পূজাবিধি দেবী নিজেই জানাইয়া দিলেন। রঘুনন্দন-স্মৃতিতে দুর্গোৎসবের ছয়টি কল্প বিধান আছে। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টমাদি কল্প ও মহানবমী কল্প। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশে, [illegible]র অঞ্চলে ও আসামে ষষ্ঠ্যশদি কল্প প্রচলিত।

এই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষের শাখায় দেবীর বোধন হয়। তৎপর আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। ঐদিনকার পূজা হয় ঘটে। পরে সপ্তমী হইতে তিন দিন মৃন্ময়ী প্রতিমায় পূজা। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্পে ও প্রতিপদাদি কল্পে, যথাক্রমে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণানবমীতে ও আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদে দেবীর বোধন হয়। প্রথম কল্পে পক্ষব্যাপী ও দ্বিতীয় কল্পে নবরাত্রি মায়ের অর্চনা হইয়া থাকে। যষ্ঠাদি কল্পে চারি দিন পূজা হয়।

মহাশক্তির আবির্ভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করেন।

মহাবিপদ্ কাটিয়া গেল বলিয়া অষ্টমীর নাম হইল মহাষ্টমী। মহাসম্পদ্ লাভ হইল বলিয়া নবমীর নাম মহানবমী।

শ্রীরামচন্দ্রের এই দুর্গোৎসবের স্মরণেই আমাদের এই শারদীয়া মহাপূজা। যিনি পূজক তিনি স্থিত শ্রীরামের ভূমিকায়। সংসারাশ্রমী সাধারণ নরনারীর দারিদ্র্যই মহাবিপদ্, ঐশ্বর্য্যই মহাসম্পদ্, জীবনযাত্রাই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহাবিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মহাসম্পদ্ লাভ মায়ের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে।

"দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা।" ৪।১৭

যাহারা যোগী, সাধনাই তাঁহাদের সমর, বিষয়বন্ধনই তাঁহাদের মহাবিপদ্, মুক্তিলাভই মহাসম্পদ্। জগজ্জননীর অর্চ্চনায় যে যোগী সাধক, সমরে জয়লাভ করেন, তাঁহার ভববন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি মুক্তিসুখে ডুবিয়া থাকেন।

"যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ।' ৪।৯

যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক অজ্ঞানতাই তাঁহাদের মহাবিপদ্, ব্রহ্মজ্ঞানই পরম ধন। মহাদেবীর অর্চ্চনায় সাধনযুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করেন, কারণ জগজ্জননী নিজেই মূর্ত্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী। যাঁহারা ভক্তিপথের উপাসক তাঁহারা বনবাসী রামচন্দ্রের ভূমিকায় নিরন্তরই ব্যথিত। তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তিরূপিণী সীতাদেবীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে অপরাধরূপী রাবণ—এই ভাবনা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বেদনাতুর করে। যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনায় মহাপরাধরূপী দশাননের বধ হয় মহাষ্টমীতে, প্রেমভক্তিরূপিণী সীতার উদ্ধার হয় মহানবমীতে। দশমীতে এই পরম সত্যানুভূতিকে হৃদয়ের গভীর তলদেশে চিত্তদর্পণে নিরঞ্জন করিয়া ভক্ত সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করেন।

মানব-সভ্যতা আজ ভোগমুখী। ভোগপ্রবণতাই অকাল, আমাদের অকাল-বোধন সফল হউক। বৃক্ষের ফলে, বিশ্বমাতার পূজার পরিচয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রসারে। মহাপূজার আয়োজনে উৎসব-মুখর আমাদের জীবন অকাশের মত উদার হউক—বাতাসের মত স্নিগ্ধমধুর হউক।

মহাপূজার উপচার

ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার যত প্রকার উপায় মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, তন্মধ্যে পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূজা তন্ত্রশাস্ত্রের এক অভিনব দান। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে এই অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠান নাই। পূজা কথাটির ঠিক অনুবাদ অন্য ভাষায় চলে না। পুষ্পচন্দনাদি কতিপয় বিশিষ্ট উপচার লইয়া দেবতার সঙ্গে যে এক অভিনব প্রকারের ব্যবহার, তাহাই আমাদের পূজা। শ্রীভগবানের সান্নিধ্য-লাভের ইহা এক শ্রেষ্ঠ পন্থা।

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের বৈদিক উপায় হল যজ্ঞ। পূজানুষ্ঠান তন্ত্রশাস্ত্রের নিজস্ব সম্পদ্। যুগ যুগ ধরিয়া এই অনুষ্ঠানটিকে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রায় সকল সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন। পূজায় দুইটি বস্তুর প্রাধান্য, মন্ত্র ও উপচার। এই নিবন্ধে কেবলমাত্র উপচারের কথাই বলিব। যে সকল উপচার দ্বারা যেভাবে ঐ কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয় তারা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। মন্ত্র-রহস্য বা প্রয়োগবিধি বলা সম্ভব নহে।

পূজার বাহ্য ও আন্তর দুইটি দিক্। উভয়েরই মূল্য সমান। কাহারও কাহারও ধারণা, বাহ্য-পূজা হইতে মানস-পূজা শ্রেষ্ঠ এবং নিম্নাধিকারীই বাহ্যপূজা করিবে। এই ধারণা ঠিক নহে। মূলতঃ বাহ্যপূজাই পূজাপদবাচ্য। বাহ্য-পূজায় অসমর্থ ব্যক্তিকেই মানসপূজা করিতে বলা হইয়াছে। বাহিরে পূজা ত্যাগ করিয়া অন্তরের পূজা বিধি নহে। বস্তুতঃ অন্তর বাহির দুই মিলিয়াই সমগ্র পূজা। মানবদেহের যেমন হস্ত-পদাদি অঙ্গ, প্রাণশক্তি অঙ্গী। পূজারূপিণী দেবী-দেহেরও সেইরূপ মন্ত্রোচারণ-পূর্বক উপচার সমর্পণ হইল অঙ্গ, অন্তরে অনুরাগ হইল অঙ্গী। এই নিবন্ধে প্রধানতঃ অঙ্গের কথাই বলিব।

বহুদিন যাহার আশাপথ চাহিয়া আছি, এইরূপ কোন অতীব প্রীতির পাত্র, অথচ মর্য্যাদাসম্পন্ন নিতান্ত নিজজন যদি আমাদের গৃহে আসিয়া উপনীত হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে যেভাবে গ্রহণ করি, সেই ভাবটি লইয়াই দেবতার পূজা। উপচারসকলও সেই ভাব লইয়াই নির্ণীত হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের কত আপন জন, কত প্রেমের পাত্র, অথচ তিনি কত বিরাট বস্তু। আজ তিনি আমাদের দুয়ারে নামিয়া আসিয়াছেন তাঁহার দিব্যধাম হইতে। তাঁহাকে সম্মান করিতে হইবে, সংবর্ধনা করিতে হইবে, পরম যত্নে সেবা করিতে হইবে। আমাদের নিজের যেরূপ স্নান, আহার, বিশ্রাম প্রয়োজন তাঁহারও সেই রকমই দরকার—এই বোধে আত্মবৎ পরিচর্য্যা তাহাই পূজার প্রধান দিক্।

সকল দেবতার পূজার অঙ্গই মূলতঃ একপ্রকার। পূজায় যদি মহাস্নান থাকে, বলি-হোম থাকে, তাহা হইলে সেই পূজাকে মহাপূজা কহে। আমাদের শারদীয়া দুর্গোৎসব একটি মহাপূজা। পূজার সময় আমরা অনেকেই পুরোহিতের উপর পূজার ভার ন্যস্ত করিয়া নিজেরা অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, পূজামণ্ডপে বসিয়া মহাস্নান হোমাদি দর্শন করি

না। দর্শন করিলে অনুভব করিতে পারা যায়, ঐ সকল অনুষ্ঠান কত বিচিত্রতাময় গম্ভীরার্থদ্যোতক। মায়ের মহাপূজার কথাই বলিব। পূজার উপচার সামর্থ্যানুসারে পঞ্চবিধ, দশবিধ ও ষোড়শবিধ হইতে পারে। মহাপূজায় ষোড়শোপচারই বিধি। বিভিন্ন গ্রন্থোক্ত নির্ঘণ্ট উপচারগুলি নামে অল্পবিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহানির্বাণতন্ত্রে ষোড়শ উপচারের নাম নিম্নরূপ—

"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কং তথাচম্যং স্থানীয়ং বস্ত্রভূষণৈঃ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপে নৈবেদ্যং চন্দনং তথা।
দেবার্চ্চনাসু নির্দ্দিষ্টা উপচারশ্চ ষোড়শ॥"

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় স্থানীয় জল, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দন এই ষোলটি পূজার উপচার।

সর্ব্বাগ্রে আসন প্রদান। স্বর্ণাসন, কাষ্ঠাসন, বস্ত্রাসন ও কুশাসন— যেইটি সামর্থ্যে কুলায় তেমনি আসন দেওয়া যাইতে পার। এই সকলের অভাবে কুশাসন অর্পণ করা চলে।' একটিমাত্র পুষ্প হাতে লইয়া "মা ইহাই তোমার আসন হউক" বলিয়াও অর্পণ করা যায়। "আসনং গৃহ্ন চার্ব্বঙ্গি" এই মর্ম্মে মন্ত্র আছে। মন্ত্রসহ আসন সমর্পণ কর্ত্তব্য।

আসন প্রদান করিলেই মা বসিবেন না। "স্বাগত" জানাইতে হইবে। লৌকিক নিয়মে 'আসুন', 'এই যে আসুন', ইত্যাদি বলিবার মত "ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্র-মুদ্রাসহযোগে জগজ্জননীকে যথাস্থানে উপবেশন করানোই স্বাগতম্। বীজমন্ত্রসহ স্বাগতম্ সুস্বাগতম্ ইত্যাদি বিনয়বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক এই কার্য্য করিতে হয়।

মাতা আসন প্রতিগ্রহ করিয়া উপবেশন করিলে তাঁহার শ্রীচরণ প্রক্ষালনের জন্য জল দিতে হয়। তাহাই পাদ্য। পাদ্যের পর অর্ঘ্য। অর্ঘ্য রচনা করিতে আটটি দ্রব্যের প্রয়োজন— জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, অক্ষত, তিল, যব ও শ্বেতসর্ষপ। "গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে" ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মাতাকে অর্ঘ্যার্পণ করিতে হয়। অতঃপর শ্রীমুখ প্রক্ষালনের জন্যে আচমনীয় প্রদেয়। শুদ্ধ জল দ্বারাই আচমনীয় দেওয়া হয়। কর্পূর ও সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত জল দিবার বিধিও আছে। মা আসিয়াছেন, সন্তানের জন্য বহু পথ অতিক্রম করিয়া, তাই তাঁহার পথশ্রান্তি অপনোদনের জন্য একটি শীতল, সুস্বাদু, পুষ্টিকর পানীয় অর্পণ করিতে হইবে। এইটিই শাস্ত্রীয় নাম মধুপর্ক। পরিমাণ মত পাঁচটি দ্রব্য মিশ্রণে মধুপর্ক তৈয়ারী হয়। দধি, ঘৃত, জল, মধু ও চিনি। কোন কোন মতে নারিকেলের জলও মিশাইতে হয়। ইহা কাংস্যপাত্রে অর্পণ করিতে হয়। মধুপর্ক সৌখ্য, ভোগ, পুষ্টি ও তুষ্টি প্রদায়ক। মধুপর্ক অর্পণের পর মুখ ধুইবার পুনরাচমনীয় দেওয়া বিধি। মায়ের ক্লান্তি দূর হইলে স্নানীয় দ্বারা স্নান করাইতে হয়। মহাষ্টমীতে মায়ের যে স্নান তাহাকে মহাস্নান বলা হয়। প্রথমে তৈল

হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা অভ্যঙ্গ ও পঞ্চশস্য চূর্ণ দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করণীয়। অতঃপর নানাবিধ জলের দ্বারা স্নান করাইতে হয়। তেত্রিশ প্রকার জলের মধ্যে কতিপয় নামকরা যাইতেছে।

শুদ্ধজল, গঙ্গাজল, সুগন্ধজল, শীতলজল, ঈষদুষ্ণজল, কুশযুক্তজল, স্বর্ণজল, রজতজল, মুক্তাজল, নারিকেলজল, তিলযুক্ত জল, সর্ব্বৌষধি জল, মহৌষধিজল, অগুরুজল, পুষ্পযুক্ত জল, শিশিরের জল, বৃষ্টির জল, চন্দনজল, শর্করাযুক্ত জল, পুষ্করিণীর জল, সহস্রাধারাজল। ইহা ছাড়া পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চশস্য ও অষ্টবিধ মৃত্তিকাযুক্ত জল ও বিষ্ণুতেল প্রভৃতি মায়ের মহাস্নানে অর্পিত হয়। সর্ব্বশেষে অষ্ট কলসী জলে স্নান করানো হয়। এই স্নান করানো দেবতাগণ আকাশ গঙ্গার জলে, মরুদ্‌গণ বৃষ্টির জলে, বিদ্যাধরগণ নদীর জলে, লোকপালগণ সমুদ্রের জলে, নাগগণ পদ্মরেণু-জলে, পর্ব্বতগণ নির্ঝরের জলে, সপ্তর্ষিগণ সব্বতীর্থ জলে ও অষ্টবসু চন্দনবাসিত জলে।

এই মহাস্নানকালে অষ্টবিধ বাদ্য বাজিবে, অষ্টবিধ রাগিণী গীত হইবে। এই সকল বাদ্য ও রাগরাগিণীর নামও শাস্ত্রে লিখিত আছে। মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্যাদি দ্বারা মাতাকে স্নান করাইতে হয়। প্রত্যেকটি বস্তু দ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র পৃথক্। অষ্ট কলসী জলে স্নানের আটটি মন্ত্র পৃথক্ ও বিশেষ প্রাণস্পর্শী। মনে হয় অনন্তর বিশ্বের সকলে মিলিয়া জগন্মাতার মহা-অভিষেক করিতেছেন।

স্নানের পর জননীকে পরিধেয় বস্ত্র অর্পণ করিতে হয়। তাঁহার সন্তান সাধ্যানুসারে মাকে কার্পাস বস্ত্র বা কৌষেয় বস্ত্র বা আরও মূল্যবান্ বস্ত্র অর্পণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া মাকে বস্ত্র নিবেদন করিতে হয়। জননী বসন গ্রহণ করিলে ভূষণ দিয়া তাঁহাকে সাজাইতে হয়। মায়ের নয়টি অঙ্গে আভরণ দিতে হয়—চরণ, কটি, বক্ষ, হস্ত, কণ্ঠ, নাসিকা, কর্ণ, সীমন্ত ও মস্তক। নূপুর হইতে আরম্ভ করিয়া মুকুট পর্য্যন্ত ভক্ত সামর্থ্যানুযায়ী মাতৃ-অঙ্গ আভরণযুক্ত করেন। অক্ষম হইলে মানসে ঐরূপ সুসজ্জিতা জননীকে দর্শন করেন।

স্নানান্তে জননীকে অঙ্গলেপনের জন্য অগুরু-চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিতে হয়। তারপর চন্দনযুক্ত পুষ্প মায়ের পাদপদ্মে দিতে হয়। ইহাই পূজার প্রধান অঙ্গ। শ্রীগীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন অর্জ্জুনকে— পত্র-পুষ্প-ফল-জল ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দিলে, আমি তাহা গ্রহণ করি। মায়ের পূজায় বিল্বপত্র ও জবা-পুষ্পাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাছাড়া মা নাগকেশর, বকুল কুন্দ, করবী, আকন্দ, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম প্রভৃতি ফুল ভালবাসেন। শ্বেত ও রক্ত-চন্দনযুক্ত পত্রপুষ্প মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মায়ের পায়ে দিতে হয়। তৎসহ ভক্তি ও অনুরাগযুক্ত আপনার হৃদয়পদ্মও ঐ শ্রীচরণপদ্মে অর্পণ করিতে হয়। অনন্তর ধূপ ও দীপ। ধূপ শব্দের নির্ব্বাচনে আচার্য্যেরা কহেন—অশেষ দোষ 'ধূত' অর্থাৎ বিনাশ করে এবং পরমানন্দ প্রদান

করে, এই হেতু ধূপ নাম সার্থক। ধূপের ধূম আরামদায়ক হইবে। কখনও এমন হইবে না, যাহাতে মায়ের চক্ষের জ্বালা হইতে পারে, "নাসাক্ষিরন্ধ্রসুখদ" হইবে। খুব তাপও হইবে না, 'নিস্তাপ' হইবে। যড়ঙ্গ ধূপ, ষোড়শাঙ্গ ধূপ ইত্যাদি বহুবিধ ধূপ-প্রস্তুত-প্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ধূপে গুল্‌গুল, চন্দনের গুঁড়া প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মাকে ধূপ-ধূম অর্পণ করিতে হয়। তৈল বা ঘৃতযুক্ত দীপদান প্রশস্ত। প্রাণীর অঙ্গজাত দ্রব্যে দীপদান নিষিদ্ধ। দীপটি হইবে নেত্রের আনন্দদায়ক। দীপে খুব তাপ হইবে না (দূরতাপপরিবর্জ্জিত), দীপ শব্দশূন্য ও ধূমশূন্য হইবে। পলিতা খুব সরু বা খুব মোটা হইবে না। দীপটি কিছু উচ্চস্থানে রহিবে যেন বসুমতীর অঙ্গে তাপ না লাগে।

মাতঃ, তোমার জ্যোতিঃই অগ্নিকে তেজস্বী করিয়াছে, তোমার জ্যোতিতেই সূর্য্য চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্। তবু মা, তোমাকে এই ক্ষুদ্র দীপ দিতেছি গ্রহণ কর। 'ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মাকে দীপ দিতে হয়। তৎসহ নিজ ক্ষুদ্র জীবনদীপটিও ঐভাবে স্নেহময় করিয়া অর্পণ করিতে হয়।

পূজার ভোগের নাম নৈবেদ্য। মা এখন আহার করিবেন। ভক্তের নিজের যাহা প্রিয়, তাহাই সে মাকে দিবে। "মনঃপ্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যম্। বালকের প্রিয় দ্রব্যাদি মা ভালবাসেন। "স্ত্রীণাং প্রীতিকরম্" দ্রব্যাদি মায়ের প্রীতিপ্রদ। শাস্ত্রে নৈবেদ্যের উপকরণের যে কত বর্ণনা তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কালিকা-পুরাণে উপকরণের বিস্তৃত নির্ঘণ্ট আছে।

ঘৃতযুক্ত শালিধানের অন্ন, মাষ, মুদগ, তিল, পরমান্ন, পিষ্টক, কৃশর (খিচুড়ি), মোদক, পৃথুক (চিড়া), ধানা (মুড়কী), দ্রাক্ষা, পনস, খর্জুর, শ্রীফল, ব্রাহ্মী, কলমী, পুনর্ণবা প্রভৃতি। শাক, ধধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনী, শর্করা, মধু ইত্যাদি সন্তান যাহা মাকে ভক্তি করিয়া দিবেন মা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন। কোন দ্রব্য ভক্তের মাকে দিতে ইচ্ছা, কিন্তু তাহা দুর্লভ। তখন 'তৎ কল্পনীয়ং মনসা', উহা মনে মনে ভাবনা করিয়া দিবে। নিত্যন্ত দীন-দরিদ্র সন্তান, মাকে কিছুই দিবার মত নাই তার ঘরে, সে কি করিবে? মনে মনে ধ্যান করিয়া সর্ব্ববিধ দ্রব্য কল্পনা করিয় নৈবেদ্য সাজাইবে, করুণাময়ী মা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন।

মা ভোগ গ্রহণ করিলে ভক্ত শ্রীচরণ বন্দনা করেন। এই বন্দনাটি অতি মূল্যবান্। আচার্য্যেরা বলেন, সকল দ্রব্য দিয়াও যদি প্রণতিটি ভক্তিপূর্ণ না হয় তবে সকলই বিফল হয়। কিছু না দিয়াও কেবলমাত্র ভক্তিপূর্ণ একটি নমস্কারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। "একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, আমার সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার চরণ পরে।।" গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন, 'মাং নমস্কুরু'। আমরাও মাকে মাকে 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ', শত-সহস্র প্রণতি জানাই। দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি সব এক করিয়া সমস্ত সত্তাটাকে মায়ের পায়ে ফেলিয়া দেওয়াই হইল শ্রেষ্ঠ প্রণাম। বন্দনাই ষোড়শ উপচারের শেষ উপচার।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ষোড়শোপচারে পূজা, মহাস্নান সঙ্গে যদি বলি ও হোম থাকে,

তাহা হইলে ঐ পূজা-মহাপূজা হয়। পূজা ও মহাস্নানের কথা বলা হইল। বলি ও হোম সম্বন্ধে দুটি কথা মাত্র বলিব। 'বলি' শব্দের অর্থ হইল উপহার। মায়ের শ্রীকরে কিছু উপহার দিতে হইবে। সুরথ রাজা "নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতং" দ্রব্যাদি দিয়াছেন। নিজ গায়ের রক্তমাকা দ্রব্যাদি। আমরা কথায় বলি "গায়ের রক্ত" অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, বহু কষ্টার্জিত বস্তু মাকে দিতে হয়।

যাঁহারা রাজসিক বা তামসিক পূজা করেন, তাঁহার বলির দ্রব্য বলিতে বুঝেন একটি নিরীহ চতুষ্পদ প্রাণী। যাঁহারা সাত্ত্বিক তাঁহারাও একটি চতুষ্পদ প্রাণী আনেন—ঐ প্রাণীটির পা হইল মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট নিজ অন্তঃকরণটি তাঁহারা মাকে দিয়া দেন। ভক্ত সাধকের গান আছে—

"ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
যদি না মানে নিষেধ
তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।"

হোম বৈদিক বিধি। মহাপূজায় বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধির একাত্মতা হইয়া গিয়াছে। অগ্নিমুখে সকল দেবতার উদ্দেশে আহার্য্য অর্পণ করিতে হয়। এই অর্পণটি পূর্ণ হয়, যখন সাধকের ভাবনায় গীতার বাণী সজীব হইয়া উঠে।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।। ৪।২৪

অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃতাগ্নি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্মে, একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মময়ী মা-ই সব। হোমের সকল অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ মাতৃময়। মায়ের স্নেহের অনলে সাধকের জীবনাহুতি হইলেই হোমাঙ্গ পূর্ণ হয়। মায়ের সন্তানের সেবায় জীবনকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া হোমাঙ্গ সার্থকতা প্রাপ্ত হয়।

জগজ্জননীতে মাতৃভাব ও মায়ের সকল সন্তানে ভ্রাতৃভাবের বিকাশে আমাদের মহাপূজা জীবন্ত হইয়া উঠুক।

পরিশিষ্ট

তান্ত্রিক সংস্কৃতি

বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত, উহা কালপ্রবাহে যতই বিকৃত এবং সঙ্কুচিত প্রতীয়মান হোক না কেন, কিন্তু ইহা সত্য যে ইহা এক বিশাল গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই প্রাচীন সংস্কৃতির আদিরূপ কি প্রকারের ছিল, বর্ত্তমানে ইহা অনুমান করা সম্ভব নয়, কেননা এ সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি তাহা ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গেই সম্বন্ধিত, তবু এ সম্বন্ধে কিছু আভাস জ্ঞান আমাদের আছে; কেননা পণ্ডিতদের দ্বারা নিরন্তর গবেষণার ফলস্বরূপ অনেকাংশ অন্ধকারকৃত ক্ষেত্রে আলোকের সঞ্চার হচ্ছে।

এই বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করলে প্রতীত হবে ইহার বিভিন্ন অংশ আছে এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে বিভিন্ন বিভাগ আছে। সন্দেহ নেই ইহাতে বৈদিক সাধনাই প্রধান, কিন্তু ইহাও মনে রাখতে হবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই ধারাতেও নূতন নূতন বিবর্ত্তন হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস-পূরাণাদির আলোচনাতে তথা ভারতীয় সমাজের আন্তরিক পরিচয় মিললে উপযুক্ত তথ্যের স্পষ্ট জ্ঞান হবে। বৈদিক ধারার প্রাধান্য হলেও ইহাতে সন্দেহ নেই যে ইহাতেও বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ হয়েছে। এইসব ধারার ভিতর যদি ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে জানা যাবে তন্ত্রের ধারাই প্রথম এবং প্রধান। এই ধারার বহু দিক আছে, যার মধ্যে এক বৈদিক ধারার অনুকূল ছিল। আগামী দিনের গবেষকগণ এই তথ্যের নিরূপণ করবেন যে বৈদিক ধারার যে উপাসনার দিক আছে, উহা অবিভাজ্যরূপে বহু অংশে তান্ত্রিক ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে এবং বহু তান্ত্রিক বিষয় অতি প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরাক্রমে চলে আসছিল। আমি জানি উপনিষদ আদিতে যে সমস্ত বিদ্যার পরিচয় মেলে যেমন—সংবর্গ, উদ্‌গীথ, উপকোশল, ভূমা, দহর, পর্য্যঙ্ক, আদি, এই সমস্ত গুপ্তবিদ্যা ইহারই অন্তর্গত। আমি বুঝি বেদের রহস্য অংশেও এইসব রহস্যবিদ্যার পরিজ্ঞানের আভাস মেলে। এ পর্য্যন্ত বলা যায় বৈদিক ত্রিকাণ্ডও আধ্যাত্মবিদ্যারই বাহ্যরূপ, যা নিম্ন অধিকারীর জন্য উপযোগী মানা হয়। এইসব আধ্যাত্মবিদ্যার রহস্যজ্ঞান যদি কখনও হয়ে যায়, তাহলে বুঝা যাবে মূলভূত বৈদিক তথা তান্ত্রিক অথবা আগমিক জ্ঞানে বিশেষ ভেদ নাই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক যে সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা বুঝতে না পারা যেতে পারে, তথাপি ইহা সত্য যে বেদ এবং তন্ত্রের নিগূঢ় রূপ একই প্রকারের। দুইই অক্ষরাত্মক, অর্থাৎ শব্দাত্মক জ্ঞানবিশেষ। এই শব্দ লৌকিক নয়, দিব্য এবং

অপৌরুষেও। মন্ত্রদর্শীগণ ইহা পেয়ে সর্বজ্ঞত্ব লাভ করতেন; তাঁরা শেষে আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা আপন জীবন সফল করতেন।

পুরাকল্পে লিখা আছে—

যাং সূক্ষ্মাং বিদ্যাং অতীন্দ্রিয়াং বাচম্ ঋষয়ঃ সাক্ষাৎকৃত ধর্মাণঃ মন্ত্রদৃশঃ পশ্যন্তি তাম্ অসাক্ষাৎকৃতধর্মাভ্য প্রতিবেদয়িষ্যমানা বিল্মং সমামনন্তি, স্বপ্রবৃত্তমিব দৃষ্টশ্রুতানুভূতম্ আচিখ্যাসন্তে।

নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনায় প্রতীত হয় ঋষিগণ সাক্ষাৎকৃতধর্মা ছিলেন এবং তাঁরা সেই সমস্ত সাধারণ মানুষকে তাদের উপদেশ দ্বারা মন্ত্রদান করতেন। যারা অসাক্ষাৎকৃতধর্মা ছিলেন সাক্ষাৎকৃতধর্মা হওয়ার দরুণ ঋষিগণ বস্তুতঃ শক্তিশালী ছিলেন, অতএব তাঁরা কারও উপদেশ শ্রবণ ক'রে ঋষিত্ব লাভ করতেন না; প্রত্যুত তাঁরা স্বয়ং বেদান্ত দর্শন করতেন। এই অভিপ্রায়ে তাঁদেরকে মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হতো। মন্ত্রার্থজ্ঞানের মুখ্য উপায় প্রতিভাস, ইহাকেই প্রাতিভ অথবা অনৌপদেশিক জ্ঞান বলা হয়। এই বিষয়ে বলা হয়—

গুরৌস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

গুরু শব্দে এখানে অন্তর্গুরু অথবা অন্তর্যামী বুঝতে হবে। এইরকম উত্তম অধিকারীদের 'দৃষ্টার্ষি' বলা হয়। শক্তির মন্দতার দরুণ মধ্যম অধিকারী ইহা থেকে অবর বা নিকৃষ্ট বুঝায়। এদের পরিচয় 'শ্রুতর্ষি' নামে মেলে। উত্তম অধিকারীর দর্শন মিলতো উপদেশ-নিরপেক্ষ হয়ে এবং মধ্যম অধিকারীর পক্ষে তা ছিল শ্রবণ-প্রাপ্ত অথবা উপদেশ-সাপেক্ষ। প্রথম জ্ঞানের নাম আর্ষজ্ঞান এবং দ্বিতীয়ের নাম ঔপদেশিক জ্ঞান। মনুসংহিতায় লেখা আছে—

আর্ষধর্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ বেতরঃ।।

কিন্তু সাধারণ অধিকারীর যে জ্ঞান হয়, উহা সৎতর্কের দ্বারা। সৎতর্কের অভিপ্রায় বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান। আগমশাস্ত্রে (ত্রিপুরা রহস্য তথা ত্রিক দার্শনিক সাহিত্য) সৎতর্ককে বিশেষরূপে মহিমান্বিত করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যেও ইহা লিখিত মেলে যে ঋষিগণ যখন অন্তর্হিত হতে লাগলেন তখন তর্কের উপরই জ্ঞানের ভার দেওয়া হল। সব সাধারণ জিজ্ঞাসুগণই অবর-কোটির, আমরা সবাই এই কোটির। এই প্রকারের জিজ্ঞাসুর জন্য সৎতর্কই অবলম্বনীয়।

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে তন্ত্রের মূল আধারের কোন গ্রন্থ নেই—ইহা অপৌরুষেয় জ্ঞানবিশেষ। এই জ্ঞানের নামই আগম। এই জ্ঞানাত্মক আগম শব্দরূপে অবতরণ করে। তন্ত্রমতে পরাবাক্ই অখণ্ড আগম। পশ্যন্তী অবস্থায় ইহা স্বয়ং বেদ্যরূপে প্রকাশিত হয় এবং আপন প্রকাশ নিজের সাথেই রাখে। ইহাই সাক্ষাৎকারের অবস্থা এবং এখানে দ্বিতীয় অথবা

অপরের দ্বারা জ্ঞানসঞ্চার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঐ জ্ঞান মধ্যমায় অবতীর্ণ হয়ে শব্দের আকার ধারণ করে। এই শব্দ চিত্তাত্মক। এই ভূমিতে গুরু-শিষ্যভাবের উদয় হয়। ফলতঃ জ্ঞান এক আধার থেকে অপর আধারে সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্র এবং গুরু-পরম্পরার প্রাকট্য মধ্যমা ভূমিতে হয়। বৈখরীতে এই জ্ঞান অথবা শব্দ যখন স্থূলরূপ ধারণ করে, তখন উহা অন্যের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রতীত হবে যে বেদ এবং তন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টি একই। যদিও বেদ এক, কিন্তু বিভক্ত হয়ে ত্রয়ী অথবা চতুর্বিধ হয়, শেষ পর্যন্ত উহা অনন্ত। 'বেদা অনন্তাঃ' ইহাও বেদেরই বাণী। আগমের স্থিতিও ঠিক এই প্রকারের। অবশ্যই তন্ত্রের আরও এক দিক আছে, যাহাতে উহার বৈদিক আদর্শ থেকে কিছু কিছু অংশে পার্থক্য প্রতীত হয় এবং ঐ কারণে তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্যও বুঝতে পারা যায়। যাইহোক্, এই সমস্ত মিলে তা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। যেমন বৃহৎ জলাধারা সকল মিলে নদীর রূপ ধারণ করে এবং শেষে মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়; তেমনি বৈদিক-তান্ত্রিক আদি অন্যান্য সংস্কৃতির ধারা সকল ভারতীয় সংস্কৃতিতে আশ্রয়-লাভ করে এবং উহাকে বিশাল থেকে বিশালতম করে তোলে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার করলে প্রতীত হয় প্রাচীনকাল থেকেই বৈদিক তথা তান্ত্রিক সাধনধারাতে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে; একথাও যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য দুইয়েতে অংশতঃ বৈলক্ষণ্যও আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিষ্টজনের দ্বারা তন্ত্রের সমাদরের অসংখ্য প্রমাণ উপলব্ধ হয়। এইরকম প্রসিদ্ধি আছে, বহু সংখ্যক দেবতাও তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতেন। তান্ত্রিক সাধনার পরম আদর্শ ছিল—শক্তিসাধনা, যার লক্ষ্য ছিল—মহাশক্তি জগদম্বাকে মাতৃরূপে উপসনা অথবা শিবোপসনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, স্কন্দ, বীরভদ্র, লক্ষ্মীশ্বর, মহাকাল, কাম অথবা মন্মথ—এরা সবাই শ্রীমাতার উপাসক ছিলেন। প্রসিদ্ধ ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক মার্গের উপাসক ছিলেন এবং কেহ কেহ তান্ত্রিক উপাসনার প্রবর্ত্তকও ছিলেন; ব্রহ্ম যামলে বহু সংখ্যক ঋষিদের নাম উল্লেখ আছে, যাঁরা শিবজ্ঞানের প্রবর্ত্তক ছিলেন; তাঁদের তাঁদের মধ্যে উশনা, বৃহস্পতি, দধীচি, সনৎকুমার, নকুলেশ আদি উল্লেখ্য। জয়দ্রথযামলের মঙ্গলাষ্টক প্রকরণে তন্ত্র-প্রবর্ত্তক বহু ঋষির নাম আছে, যেমন দুর্বাসা, সনক, কশ্যপ, সংবর্ত, বিশ্বামিত্র, গালব, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, ভৃগু আদি।